শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাঁশিওয়ালা

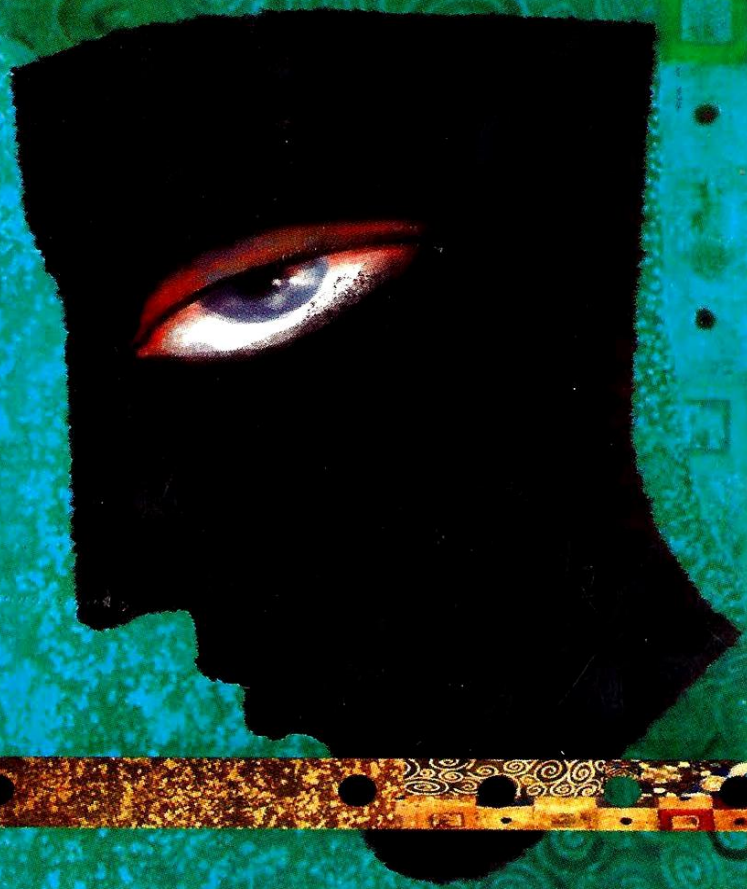

'বাঁশিওয়ালা'য় আছে প্রথিতযশা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দুটি অপরূপ উপন্যাস 'বাঁশিওয়ালা' এবং 'কোলাজ'।

'বাঁশিওয়ালা' ১৪১৪ বঙ্গাব্দের 'শারদঅর্ঘ্য' সম্মানে ভূষিত। বিদেশের অভ্যস্ত জীবন থেকে দেশে ফিরে এল মৃদুল। ফিরল তার শৈশবের চেনা গ্রামে। বউ লুইজা মেয়ে নিলিকে নিয়ে কানাডায় চলে গেছে। বিয়ে ভেঙে গেছে মৃদুলের। গাঁয়ের বাড়ির জমিজমা সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে মৃদুল, এমনই ইচ্ছা। সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের কড়াক্রান্তি হিসেবে সমেত সব আগলে আছেন হরপ্রসন্ন। মৃদুল নিজের জমিজমা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল প্রকৃতির প্রাণ। ধানের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছ। এ তার বিস্ময়। এই বিস্ময় সমেত মৃদুলকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এক জাদুর জগৎ। মৃদুল বাঁশি বাজাল আর আকাশ বাতাস, মূক প্রাণীকুল হল বাঙ্ময়। মৃদুলের বিচ্ছিন্ন শিকড় আবার চারিয়ে গেল গ্রামের ভুঁয়ে।

'কোলাজ' উপন্যাসে বিচিত্র সব চরিত্র শীর্ষেন্দুর কলমে উপস্থিত। নানা রকম হৃদয়ের খেলা। নীলরঙা জিনস আর সাদা কুর্তায় অনন্যা বিটু যেভাবে গৌরাঙ্গের কাছ থেকে চুম্বন আদায় করে, লুটেরা বাতাসে ছোড়ে রহস্যময় ফিসফিস, তার তুল্য ভালবাসা ক'বার আসে জীবনে?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহে। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি.এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন বৃত্তি—সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম গল্প—'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার, 'দূরবীন'-এর জন্য।

'মানবজমিন' উপন্যাসে পেয়েছেন ১৯৮৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং সহপ্রতিঋত্বিক।

প্রচ্ছদ অমিতাভ চন্দ্র

বাঁশিওয়ালা

~

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

এই বইতে
বাঁশিওয়ালা
কোলাজ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১

© শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-699-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

BANSIWALA
[Novel]
by
Sirshendu Mukhopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

শ্রীভারতেন্দু হালদার
শ্রীমতী অঞ্জলি হালদার
করকমলেষু

বাঁশিওয়ালা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তুমি বিদ্যাবান লোক মশাই। আমাদের মতো ন্যাদাভ্যাদা তো নও। কত কেতাব ঘেঁটে এয়েছ। তোমার সামনে নিজেকে ভারী ছোট্টটি মনে হয়। যেন এখনও দাগা বুলোনোর পাট চোকেনি। তা ওই চেয়ারটায় বোসো মশাই। কেঠো চেয়ার, পাছায় লাগবে হয়তো। কিন্তু আর তো নেই। বলো তো একখানা বালিশ পেতে দিই।

না, না, বালিশ লাগবে না। এতেই বেশ বসতে পারব। বলে মৃদুল চেয়ারখানায় বসে পড়ে।

পাশেই একখানা কাঠের মজবুত টুলের ওপর গয়ানাথ। টুলখানার মাঝখানে ইংরিজি এস অক্ষরের মতো ফাঁক আছে। ওইতে আঙুল ঢুকোলে বেশ টুলটাকে এধার সেধার বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ছেলেবেলায় দেখেছে মৃদুল। মনে পড়ে।

ওই কালো ও মোটা গয়ানাথ তাকে স্টেশনে আনতে গিয়েছিল। তাকে নাকি ছেলেবেলায় চিনত। মৃদুলের মনে পড়ে না।

এটা আগস্ট মাস। গরমের ভ্যাপসা ভাবটা আছে বলে বেশ ঘামছে মৃদুল। মোটা গয়ানাথের ঘাম আরও বেশি। কিন্তু মুখের পানের ঢিবিতে সে এত রসস্থ হয়ে আছে যে দেহবোধে কিছু টের পাচ্ছে বলে মনে হয় না।

হরপ্রসন্ন বেশ সুঁটকো এবং বুড়ো। ওর মেদহীনতা দেখার মতো। কণ্ঠমণির ওঠানামা দূর থেকে দেখা যায়। মুখের চামড়ার নীচে করোটি ফুটে আছে। দাড়ি গোঁফ নেই। কিন্তু গালের বড় বড় গর্তের মধ্যে ক্ষুর পৌঁছয় কী করে সেটাই প্রশ্ন। এ খানাখন্দের দাড়ি কামানো নিশ্চয়ই সহজ কাজ নয়। একখানা কালপ্রাচীন নেড়া তক্তপোশের ওপর হরপ্রসন্ন দুই রোগা হাতে জড়ো করা হাঁটু বেড় দিয়ে বসে আছে। গা আদুর, পরনে

আধময়লা লালপেড়ে মোটা ধুতি। দু' হাতে অনেক পাকা লোম। বয়স কত হবে? সত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যেই বলে মনে হয়। তক্তপোশের বয়স বোধহয় তার চেয়েও বেশি।

তোমার কি রুকুর কথা মনে আছে মশাই?

মৃদুল মাথা নেড়ে বলে, না।

মনে থাকার কথাও নয়। শিশুকালে তোমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা তখন রুকুর বয়স বছর তিনেক হবে। তোমার বোধহয় সাত আট। বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে। রুকুর তেমন লেখাপড়া হয়েছিল না। তারপর ক্লাস সিক্স না সেভেনে যখন উঠেছে তখন ব্যামোয় ধরল। সে অসুখ কিছুতেই সারে না। রোগা হয়ে হয়ে কাঠিসার হয়ে মরেই গেল। বেঁচেবর্তে থাকলেও তোমার মতো বিদ্যাবানের সঙ্গে মানানসই হত না। ওই যে তাদের বাড়ি। কোঠাবাড়িই ছিল এক কালে। এখন জঙ্গল।

গ্রামটা খুব আবছা চেনা লাগছে মৃদুলের। একটা ক্ষয়াটে ছবি। যা মনে আছে তার সঙ্গে সবটা মিলছে না। আর অনেকটাই দীনদরিদ্র ময়লা আর ধুলোটে লাগছে। রুকুকে তার মনে নেই। সে যে মারা গেছে সেটা সে একবার শুনেছিল হয়তো। কিন্তু সেটার কোনও সংবাদমূল্য ছিল না তার কাছে।

ওদের বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?

না। কে আর থাকবে? ওই তো মেয়েটাই যা ছিল ওদের। মেয়েটা যাওয়ার পর কিছুদিন বেঁচে ছিল। তার পর তারা যে যার সময় হলে চলে গেল।

একটু চুপ করে থেকে হরপ্রসন্ন ফের বলল, জীবন অনিত্য মশাই।

সে তো বটেই।

সে তো তুমি ভালই জানো মশাই। এতটুকু বয়সে কত দাগা পেলে। মা নেই, বাবা নেই, বড় ভাইটা পর্যন্ত বিদেশ বিভুঁইয়ে—

গয়ানাথ একটু সতর্ক গলায় বলল, থাক না কাকা ওসব কথা!

তা বটে। ওসব ভেবে, জপ করে লাভও নেই।

BanglaBook.org

মৃদুল মৃদু স্বরে বলল, ওসব আমার সয়ে গেছে। ঘটনার ওপর তো আমাদের হাত থাকে না।

শুনলুম তোমার খুব টাকার দরকার। তোমার রোজগারপাতি কি ভাল নয় মশাই?

খারাপ নয়। টাকাটা দরকার একটা বিশেষ কারণে।

তা তো হতেই পারে। কত সময়ে দুম করে দরকার হয়ে পড়ে বইকি। কিন্তু গাঁয়ের বিষয়সম্পত্তি বেচে আর কতই বা হবে বলো। তোমার কি অনেক টাকা দরকার মশাই?

আমার গ্রাম সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। আমাদের জমিজমা কত আছে, দলিল দস্তাবেজ কার কাছে সেসবও জানা নেই। শুধু জানতাম, আপনি নাকি দেখাশোনা করেন।

সেসব ভাবনা নেই। পরিপাটি কাগজপত্র আছে। দলিল-টলিল ঠিকই আছে সব। মোকদ্দমাও নেই কিছু। পরিষ্কার দলিল। তোমার জ্যাঠা বিয়ে করেছিলেন না বটে, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি এলোমেলো হয়নি। তাঁকে তোমার মনে আছে তো!

হ্যাঁ। জ্যাঠামশাইকে শেষ দশ বছর দেখিনি। আমি বিদেশে ছিলাম।

সে জানি। তোমার জ্যাঠা গোবিন্দবাবুই বলেছিলেন। দুই ভাই-ই মেমসাহেব বিয়ে করেছ। তা জ্যাঠা তাতে দুঃখ পেয়েছিলেন। বলতেন, ওরা আর দেশেই ফিরবে না। গাঁয়ের এইসব জমিজমা কী হবে কে জানে। শেষ দিকটায় বড় কাতর ছিলেন। মানুষের মুখ দেখার জন্য বড্ড হ্যাঁদাতেন। কুকুর বেড়াল পুষে কি আর জনের অভাব মেটে। ওই লক্ষ্মীই গিয়ে দেখেশুনে আসত।

লক্ষ্মী কে?

হরপ্রসন্নের ঘোলাটে চোখে ভারী একটা দুঃখের মেদুর ছায়া পড়ল যেন। উদাস গলায় বলল, আমার অভাগী মেয়ে। কলঙ্কিনীই ধরে নিয়ো মশাই। তার ছেলের এই চোদ্দো বছর বয়স।

ফের গয়ানাথ চাপা গলায় বলে, ওসব কথা থাক না এখন।

দেখ গয়া, গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে শোনার চেয়ে আমার কাছে শোনা

BanglaBook.org

ভাল। জানলে মশাই, আমার মেয়েটার কিন্তু বিয়ে হয়নি, কুমারী মা।

মৃদুল সামান্য বিস্ময় অনুভব করে শুধু বলল, ও।

আর কিছু বলা উচিত হবে কি না তা বুঝতে পারল না। তবে হরপ্রসন্ন সাহসী মানুষ। এসব কথা অকপটে বলতে কলজে চাই। হরপ্রসন্নের কিন্তু নির্বিকার ভাব। বলল, বাচ্চাদের পিতৃপরিচয় না থাকলে ইস্কুল কলেজে বড় মুশকিল হয় মশাই।

পৃথিবীতে ধীরে ধীরে মনুষ্যসমাজে পিতৃপরিচয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন হয়তো কমছে। তার নিজের একটি মেয়ে আছে। দেড় বছর বয়স। তার আমেরিকান বউ লুইজ়ার সঙ্গে তার মাস ছয়েক আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। মৃদুল গত ছয় মাস মেয়েকে দেখেনি। এবং কী আশ্চর্য, ছয় মাসের মধ্যেই তার মেয়ের অদর্শনজনিত কষ্ট অনেকটা কমেছে। লুইজ়া গেছে কানাডায়। লুইজ়া আবার বিয়ে করলে মেয়ের পদবি পরিচয় সবই হয়তো পালটে যাবে। শেষ অবধি নিলি, অর্থাৎ তার মেয়ের জীবনে মৃদুল হয়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

হরপ্রসন্ন কী যেন বলছিল, অন্যমনস্ক ছিল বলে প্রথমটা শোনেনি, মাঝখান থেকে শুনতে পেল, লক্ষ্মী সব তকতকে রেখেছে ঘরবাড়ি। গিয়ে জলে পড়বে না মশাই। ক'টা দিন কি থাকা হবে?

হ্যাঁ। একেবারে বিক্রি করে দিয়ে যাব।

গাঁয়ে খারাপ লাগবে না তো!

থেকে দেখি। এক সময়ে তো ছিলাম। তখন খারাপ লাগত না।

জায়গা তো একই থাকে, মানুষ পালটে যায়।

মৃদুল সামান্য শুকনো হাসি হেসে বলল, সেটাই তো স্বাভাবিক। ছোট থেকে বড় হয় তো, চোখ পালটায়, চিন্তা বদলে যায়।

সে বড় ঠিক কথা। তাহলে থাকো কিছুদিন, তোমাদের বাড়িতে বেশ থাকতে পারবে। রোজ ঝাড়ামোছা হয়।

সেই বাড়িতে কি কেউ থাকে?

না মশাই, কেউ থাকে না। শুধু রাতে পেঞ্চা আর তার ভাই গিয়ে শোয়। পাহারা না থাকলে যে কিছু রক্ষে হয় না।

BanglaBook.org

মঞ্জা কে?

সে ডাকাতে মানুষ। তোমাদের জমি তারাই চষে কি না। তোমার জ্যাঠার আমল থেকে ওরাই চষে আসছে। আগে ওদের বাপ দাদা করত। এখন ওরা।

তাহলে গিয়ে একটু দেখি।

এসো গিয়ে। লক্ষ্মী ও বাড়িতেই আছে। তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। আর দলিল-টলিল সব আমার কাছে আছে। কাল সকালে সব বুঝিয়ে দেবো'খন।

আমি ওসব বুঝব না। দলিল দিয়ে আমার হবেটাই বা কী। বিক্রি হয়ে গেলেই হল।

হাজির খরিদ্দার পাবে না মশাই। লোক লাগাতে হবে। ক'দিন গাঁয়ের হাওয়া-বাতাস খাও।

বাড়িটা দেখে মৃদুল অবাক হল। অন্তত গত সাত-আট বছর এ বাড়িতে কেউ বাস করেনি। জ্যাঠা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বসবাস করার মতো কেউ ছিল না। তবু দেখে মনে হয়, যেন ঘর ভরতি সংসার আছে। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। বেশ বড়সড়। স্থাপত্যের তেমন গরিমা নেই। টানা দরদালান আর লাগোয়া ঘর। পর পর বড় বড় ঘর। নীচেরতলায় মোট আটখানা, ওপরতলাতেও তাই। বাড়িটা ইংরেজি এল অক্ষরের মতো। মাঝখানে বিরাট উঠোন, ইঁদারা, অন্য ধারে রান্নাঘর আর পাশাপাশি চাকরদের থাকার ঘর কয়েকখানা। বিস্তর গাছপালা আছে, পিছনে মস্ত বাগান।

যা ভেবে এসেছিল সে, তা নয়। বাড়ির লাল ইটের দেওয়ালে কোথাও অশ্বত্থের চারা বা শ্যাওলা গজায়নি। বেশ ঝকঝক করছে দেওয়াল। উঠোন যেন তকতকে এবং তুলসীমঞ্চে সতেজ তুলসীর গাছ।

গয়ানাথ উঠোনে পা দিয়েই হাঁক মারল, লক্ষ্মীদিদি, কই গো!

একজন বছর চল্লিশের মহিলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি। চেহারাটা রোগার দিকেই। বেশ লম্বা। হরপ্রসন্নের মুখের সুস্পষ্ট আদল আছে মুখখানায়। তবে এঁর লাবণ্য

BanglaBook.org

আছে। চোখ দুখানা সুন্দর আর মাথায় এলো কোঁকড়া চুল। মুখে কোনও বিগলিত আপ্যায়নের হাসি নেই, সম্ভ্রমের ভাব নেই, ভয় নেই। তাদের দিকে একটু হেসে মৃদুলকেই বলল, এখানেই রান্নার বন্দোবস্ত হয়েছে। বিশ্রাম নিয়ে স্নান করে এসো। খিদে পেলে সেবা ভাত দেবে।

মৃদুল খুশিই হল। কলকাতা থেকে অনেকটা পথ। রাস্তাঘাটে খাওয়ার অভ্যাস তার নেই। বিশেষ করে এ দেশে। মুখে ভদ্রতা করে বলল, রান্নার কী দরকার ছিল। দোকান থেকে—

কথাটা বলেই অসম্ভাব্যতা বুঝে থেমে গেল সে। এ তো শহর নয় যে, দোকান-থেকে খাবার আনানো যাবে।

লক্ষ্মী বলল, তুমি যে ক'দিন থাকবে সেবাদিই রান্না করে দিয়ে যাবে।

মৃদুল একটুক্ষণ দেখল লক্ষ্মীদিকে। ইনিই সেই সাহসী মহিলা। বিদেশে সিঙ্গল মাদার এবং কুমারী মায়ের অভাব নেই। তবে সেখানে পরিবেশ আলাদা। বাচ্চার পিতৃপরিচয় নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না কেউ। কিন্তু এ দেশে তো তা নয়। ছোট গাঁয়ের বদ্ধ সমাজে সমস্যাটা বড় ভয়ংকর। লক্ষ্মীদি যথার্থ সাহসী।

দরদালানে ওঠার আগে বাইরে চটি ছাড়ল গয়ানাথ। বলল, তুমি জুতো নিয়েই এসো। ওই দিকে জুতোর র‍্যাক আছে, ওখানে খুলো।

মৃদুল দেখতে পেল, দরদালানে তার স্যামসোনাইট সুটকেশখানা সযত্নে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা। পাশে চামড়ার বড় ব্যাগখানা।

আমি কি দোতলায় থাকব?

একতলাতেও থাকতে পারো। তবে দোতলায় আলো-হাওয়া বেশি, পোকামাকড় কম।

ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ পাচ্ছি যেন!

হ্যাঁ। বর্ষার শেষ, সাপখোপ উঠে আসে অনেক সময়ে। ব্লিচিং ছড়ালে ওসব তফাত থাকে।

দোতলাটা একতলার মতোই। একই রকম। সারি সারি ঘর। ঘরে প্রচুর আসবাব।

BanglaBook.org

জ্যাঠামশাই এত জিনিস দিয়ে কী করতেন? এত ট্রাঙ্ক বাক্স কেন? এত খাট পালঙ্ক?

এসব তো তাঁর একার জন্য নয়। বড় পরিবার ছিল এক সময়ে তোমাদের। তাদেরই সব ফেলে-যাওয়া জিনিস জমে ডাঁই হয়ে আছে।

বাক্স-প্যাঁটরায় নিশ্চয়ই দামি জিনিস নেই?

গুপ্তধনের কথা বলছ? না, তা নেই। পুরনো কাপড়-টাপড় আছে।

আমরা কিন্তু নীচের একটা ঘরে থাকতাম। জানালার ধারে একটা আতা গাছ ছিল। কিন্তু ঠিক কোন ঘরটা তা আর মনে নেই।

তুমি একদম কোণের ঘরে থাকবে। তিন দিক খোলা। পুব-দক্ষিণ-পশ্চিম। ওটাই কর্তাবাবার ঘর।

কর্তাবাবা কে?

তোমার দাদু।

বাস্তবিক ঘরখানা ভারী ঝলমলে। বড় বড় জানালা দিয়ে প্রচুর আলো-হাওয়ার অনুপ্রবেশে ঘর যেন লুটোপুটি খাচ্ছে খুশিতে। একখানা জবরদস্ত আর বিশাল পালঙ্ক। সবই চেনা লাগছে এখন। শ্বেতপাথরের গোল টেবিলখানা সে ভোলেনি। কাঠের বড়সড় ভারিক্কি একখানা আলমারি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এক প্রান্তে একখানা ডেক চেয়ার। একটা ভারী হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারও মজুত।

সে গয়ানাথকে বলল, আপনি বসুন।

পরে আসব। তুমি পোশাক-টোশাক ছাড়। স্নান করে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। একা থাকতে খারাপ লাগবে কি?

না। একা থেকেই অভ্যাস।

রাতে নীচের ঘরে মঞ্চা আর পচন থাকবে।

আচ্ছা, সব ঘরের দরজাই কি সব সময়ে খোলা থাকে?

আরে না। আজ তুমি আসবে বলে খুলে রাখা হয়েছিল। নইলে সব সময়ে সব ঘরে তালা ঝোলে।

দাদুর যৌবন বয়সের একটা ছবি দেওয়ালে লক্ষ করল মৃদুল। কৃত্রিম ছবি। পিছনে রাজবাড়ির সিনারি টাঙানো, পায়ের কাছে ফুলের টব।

BanglaBook.org

দাদুর পরনে কোট প্যান্ট এবং টাই। জন্মে দাদুকে ওরকম পোশাক পরতে দেখেনি সে।

এ ঘরেও খাটের নীচে একটা ট্রঙ্ক রয়েছে। এ বাড়িতে বোধহয় শতখানেক ট্রাঙ্ক। এত ট্রাঙ্ক কেন কে জানে বাবা। পুরনো কাপড়, বাসন বা কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু থাকার কথা নয়। এসব ট্রাঙ্ক আজকাল শহরে ব্যবহার হয় না।

একজন মুনিশ গোছের লোক তার সুটকেশ আর ব্যাগ বয়ে নিয়ে এল।

গয়ানাথ বলল, পাশের ঘর থেকে ছোট বেঞ্চখানা নিয়ে এসে তার ওপর রাখ। দামি জিনিস তো।

লোকটা বেঞ্চ নিয়ে এসে দেওয়াল ঘেঁষে পেতে সযত্নে জিনিস দুটো রেখে চলে যাচ্ছিল।

মৃদুল বলল, ওকে পয়সা দিতে হবে না?

পয়সা কীসের? যখন চলে যাবে তখন দু' টাকা-পাঁচ টাকা দিয়ো, সেটাই ঢের। এবার আমি চলি। ওই পশ্চিমের দিকটায় কলঘর আছে। তোলা জল আছে, চান করে নিয়ো সময়মতো। বেলা বেশি হয়নি এখনও।

এ বাড়ির ভ্যালুয়েশন কী রকম জানেন?

ভালই হবে। জমি আছে অনেকটা, বাগান, পুকুর সমেত বিশ-পঁচিশ লাখ উঠে যেতে পারে দর।

কিনবে কেউ?

দেখা যাক। বিকেলে কথা হবে'খন। যাই।

একটু বেশি বয়সে, বিশেষ করে অবসরকালে বসে বসে স্মৃতিচারণ এক উত্তম এন্টারটেনমেন্ট। এবং স্মৃতি যেহেতু সর্বদাই প্রতারক, তাই অনেক কিছুকেই লার্জার দ্যান লাইফ সাইজ মনে হয়। যেমন এই ঘরখানার কথাই ধরা যাক। ছেলেবেলায় তার চোখে এই ঘরখানা বিশাল বড়, মাঠের মতো মনে হত। এখন তা হচ্ছে না। না, ঘরটা তো ছোটও নয়। বেশ বড়ই। তবু যতটা মনে হত, ততটা নয়। কিছুদিন সে

BanglaBook.org

স্মৃতিচারণার চেষ্টা করল, কিন্তু ছেলেবেলার স্মৃতির চেয়ে হাল আমলের স্মৃতি অনেক বেশি দগদগে বলে সেগুলোই ফাঁক ফেলে হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল তার বিবাগী বউ লুইসা বা লুইজা। আহ্লাদি গোলগাল মেমসাহেব। আসলে ম্যাসিডোনিয়ার মেয়ে। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রিন কার্ড পেয়েছিল। অড জব করে দিন চালাত। মৃদুল তখন তার দাদা প্রতুলের প্রভাবে বিস্তর চেষ্টায় আমেরিকায় হাজির হয়েছিল। দেশে কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়াত। ওই ডিগ্রিতে ও দেশে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজ নয়। পিএইচডি করতে হলে টাকা এবং শ্রম দুই-ই দরকার। তার আগে দরকার আশ্রয়। মেম বউদি প্রথমে ভাল ব্যবহার করলেও পরে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে লাগল যে, তাদের সংসারে দেওরের অনুপ্রবেশ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। মৃদুল অগাধ জলে পড়ে যায়। দাদা দুঃখ পেলেও তার তেমন কিছু করার ছিল না। তারা দু' ভাই নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বললে বউদি মারি অসম্ভব রেগে যেত, বলত, তোমরা নিজেদের ভাষায় আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলছ। অশান্তি বেড়ে যাওয়ায় মৃদুলকে দাদার বাড়ি ছাড়তে হয়। বছর পাঁচ-সাত কাটে নানা দুর্গতিতে। পি.এইচ.ডি হয়নি, ফলে তাকেও দোকানে, গ্যাস স্টেশনে, রেস্টুরেন্টে কাজ করতে হয়েছে। সেই সূত্রেই লুইজার সঙ্গে আলাপ এবং বিয়ে। কিন্তু বিয়েটা দু' বছরও টেকানো যায়নি। বিচ্ছেদের হৃদয়গত বেদনা তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু পকেটের বেদনাটাই হয়ে দাঁড়ায় সাংঘাতিক। কোর্টে যে সেটেলমেন্ট হল তাতে মৃদুলের আর খাওয়ার পয়সা অবধি রইল না। অ্যালিমনি এবং চাইল্ড সাপোর্টে সে একরকম ছিবড়ে হয়ে গেছে। আর ইতিমধ্যে হঠাৎ ডালাস থেকে হিউস্টন যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় দাদা মারা যায়। গোপনে কিছু কিছু সাহায্য করত দাদা, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির লোন, ইনসিওরেন্স, ট্যাক্স, ক্রেডিট কার্ড সব মিলিয়ে মৃদুলের নাজেহাল অবস্থা। আমেরিকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে একদিন কিছু না কিছু হবেই, এই বিশ্বাসটা ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে। এখন তার

BanglaBook.org

চৌত্রিশ বছর বয়স। শেষ চেষ্টা হিসেবে সে দেশের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করতে এসেছে। বারাসতের কাছে বাবা একটা জমি কিনে রেখেছিল, বাড়ি করতে পারেনি। সেই জমিটা গত বছর বিক্রি করে যা পেয়েছিল তা ডলারে গিয়ে দাঁড়াল হাস্যকর রকমের কম। তা দিয়ে সুরাহা হল না তেমন। এটাই তার শেষ চেষ্টা হবে, কারণ তারপর আর বিক্রি করার মতো কিছুই থাকবে না। তবু ভাল যে, এই বংশের এখন সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী। একজন সুদূর দাবিদার আছে বটে, তার মেম-বউদি আর ছোট ভাইঝিটা। তবে তাদের হিসেবের মধ্যে না ধরলেও চলে।

একটি ফরসা কাপড়-চোপড় পরা মাঝবয়সি মহিলা এসে বলল, বাবু, খাবে চলো, দিদি বসে আছে। তোমাকে খাইয়ে তবে বাড়ি গিয়ে বাপকে খেতে দেবে।

সে সচকিত হয়ে উঠে বলল, এমা, ছিঃ ছিঃ, উনি আমার জন্য বসে আছেন কেন? ওঁকে বাড়ি যেতে বলুন। আমি খেয়ে নিচ্ছি।

তুমি তাড়াতাড়ি চান করে এসো নীচে।

তারা বরাবর কুয়োতলায় চান করত। বড় বাইরে যেতে হত করমচাতলার সার্ভিস ল্যাট্রিনে। জ্যাঠামশাই যে দোতলায় আধুনিক বাথরুম করেছেন, সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার। আলাদা করে বাথরুম তৈরি হয়নি। কোণের অব্যবহৃত একটি বড়সড় ঘরকেই দিব্যি বাথরুম বানানো হয়েছে। অবাক করার ব্যাপার হল, বাথরুমটি বেশ আধুনিক। কমোড এবং শাওয়ার আছে। তবে শাওয়ারে বা ফ্ল্যাশ টানলে জল আসবে না। ওভারহেড ট্যাঙ্ক বা পাম্প নেই। হয়তো করা হত, সময় পাননি।

তোলা জলে স্নান করে খেতে নামল মৃদুল। রান্নাঘরটা বিশাল বড়। রান্নাঘরেই বরাবর পিঁড়ি পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার অন্যথা হয়নি আজও।

লক্ষ্মীদি ওদিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে বলল, পিঁড়িতে বসে খেতে অসুবিধে হবে নাকি?

BanglaBook.org

না, অসুবিধে কীসের?

অসুবিধে হলে বলো, টেবিল-চেয়ারের অভাব নেই বাড়িতে। নামিয়ে আনার ব্যবস্থা হবে।

অসুবিধে হলে বলব। পিঁড়িতে খারাপ লাগছে না তো।

ঝুঁকে বসে খেতে হয়, পেটে চাপ পড়ে।

তা ঠিক। দেখাই যাক না।

লক্ষ্মীদি একটু গম্ভীর মানুষ। বোধহয় ব্যক্তিত্বও আছে। গেঁয়ো, বোকা বা অদূরদর্শী বলে মনে হচ্ছে না। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। তাহলে ঘটনাটা ঘটতে দিলেন কেন?

এ বাড়ির রান্না ভীষণ ভাল। একটু ঝাল বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন জাঙ্ক ফুড খাওয়া মুখে বড়িভাজার গুঁড়ো আর নারকোল দিয়ে মোচার ঘণ্ট, কাঁচকলার কোপ্তা, উচ্ছে ভাজা, পোস্ত-আলু, কুমড়োর ছক্কা বড্ড ভাল খাচ্ছিল মৃদুল।

আজ শনিবার বলে নিরামিষ হয়েছে। কাল থেকে মাছ হবে।

নিরামিষও চলতে পারে। আমার খাওয়ার বায়না নেই।

রাতে রুটি না ভাত?

এই ভাতের গন্ধটা খুব সুন্দর তো! ভাতই খাব ক'দিন।

সীতাশাল চাল।

আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন কেন? হরপ্রসন্নকাকা না খেয়ে বসে আছেন।

বাবার এমনিতেই দেরি হয়। খেতে চান না। ওঁর খিদে হয় না।

উনি আমাকে খুব বিদ্বান মানুষ বলে ধরে নিয়েছেন। আমি কিন্তু তা নই। আগে কলেজে পড়াতাম বটে। বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া ছেড়ে প্রায় শ্রমজীবীর কাজে নামতে হয়েছে।

কেন? লেখাপড়া করতেই তো গিয়েছিলে!

হ্যাঁ। কিন্তু হল না। বড় কঠিন ঠাঁই।

লক্ষ্মীদি আর কিছু বলল না। বেশি কৌতূহল নেই, কিংবা ভদ্রতায় বাধল।

BanglaBook.org

মাঝবয়সি মহিলাটিই পরিবেশন করছিল। বেশ পরিষ্কার হাত-পা, দেওয়া-থোয়ায় সংযত।

দুপুরে লাঞ্চ করা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছে মৃদুল। লাঞ্চ করলেই আলসেমি আসে। আজ কিন্তু পেট ভরে খেল। একটু বেশিই হয়ে গেল হয়তো। এখানে কাজ নেই। দুপুরে ঘুমোবে।

লক্ষ্মীদি বলল, এ হল বিন্দুর মা। ক'টা দিন ওই তোমাকে রেঁধেবেড়ে দেবে।

বিন্দুর মা কেন? ওঁর কি আলাদা নাম নেই?

এখানে ওরকমই রেওয়াজ। ওর নাম সেবা।

বাঃ, এটাই তো ভাল।

তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাঁদিকের প্রথম ঘরখানায় একটা সিন্দুক আছে। জ্যাঠামশাইয়ের যা কিছু দামি জিনিস বা টাকাকড়ি ওর মধ্যে। চাবি বাবার কাছে আছে। সময়মতো খুলে দেখো।

দেখব দিদি।

বিকেলে চাবি দিয়ে যাব।

তাড়া নেই। দিন কয়েক তো আছি।

তার অনেক টাকা দরকার। তত টাকা এ বাড়িতে পাওয়ার আশা নেই। জ্যাঠামশাইয়ের সিন্দুকে যদি দু'-তিন লাখও পাওয়া যায় তাহলে তা ডলারে দাঁড়াবে কয়েক হাজার মাত্র। কাজেই সিন্দুকের কথায় তার মন বিশেষ নেচে উঠল না।

আগে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। আজকাল হয়েছে। দাদুর ঘরে একটা সিলিং ফ্যান আছে। সেটা সুইচ টিপতেই চলল। অর্থাৎ পাওয়ার কাট হয়নি, ভরপেট মৃদুল পাখার হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে ঘুমের পর এমন একটা আলস্যজড়িত নিশ্চিন্দির ভাব পেয়ে বসল তাকে, যে মনে হচ্ছিল তার কোথাও কোনও সমস্যা নেই। সেবা বেশ চা বানায়। চিনি একটু বেশি বটে, কিন্তু খারাপ লাগল না। দরদালানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল সে। তারপর ছাদে উঠল। চারদিকে

BanglaBook.org

প্রচুর গাছপালা এবং বাড়িঘর পেরিয়ে দিগন্ত। বেশ দূরে কোথাও ফুটবল খেলা হচ্ছে, বল পেটাপেটি এবং সোল্লাস চিৎকার ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। কলকাতার চেয়ে তাদের গ্রামের আবহাওয়া অনেকটাই ঠান্ডা। ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের এই একটু আগেই বাতাসে মিহিন একটু চোরা শীত টের পাচ্ছে সে।

সন্ধের পর বিজলি বাতি জ্বলল ঘরে। লক্ষ্মীদি এক গোছা চাবি তার বিছানার পাশের গোল টেবিলটায় রেখে বলল, এই চাবি।

আমরা তো কেউ আসতাম না, জ্যাঠামশাই শেষ জীবনটায় বড্ড একা হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

একা! না, একা হবেন কেন? আমরা তো ছিলাম। গাঁয়ের সব মানুষের সঙ্গেই খুব ভাব ছিল জ্যাঠামশাইয়ের।

তবু আমরা তো আমাদের কর্তব্য পালন করিনি।

কেই বা করে বলো। ঠিকঠাক কর্তব্য পালন করতে আমি আজ অবধি কাউকে দেখিনি। টান ভালবাসা না থাকলে শুধু কর্তব্য করাটা বড্ড ফরমাল হয়ে দাঁড়ায়। রাতে কী খাবে বলো তো!

কথাটা দুম করে ঘুরে যাওয়ায় মৃদুল মৃদু হাসল। লক্ষ্মীদি বেশ বুদ্ধিমতী। বলল, খাওয়া নিয়ে আমার কোনও বায়নাক্কা নেই। অনেকদিন গরম ভাত, ঘি আর আলুসেদ্ধ দিয়ে মেখে খাওয়া হয়নি। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা।

বেশ তো। তাও হবে। বিকেলে বেরিয়েছিলে?

না, আজ ইচ্ছে করল না। দুপুরে ঘুমিয়ে শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। কাল দেখা যাবে। আপনার সঙ্গে তো গল্প করাই হয়নি এখনও।

আমার কোনও গল্প নেই। কাজ করতে করতে দিন কেটে যায়।

আমি যখন এই গাঁয়ে ছিলাম তখন হরপ্রসন্নকাকাকে চিনতাম না। আপনাকেও না। আমাকে কি আপনার মনে আছে?

না। ছেলেদের দঙ্গলে দেখেছি হয়তো, মনে থাকার কথা নয়।

আমার দাদা প্রতুল আমার চেয়ে দশ বছরের বড় ছিল। দাদা ভীষণ হ্যান্ডসাম ছিল। তাকে মনে আছে?

BanglaBook.org

আছে।

আমার এক বন্ধুকে মনে আছে, তার নাম ছিল কাউড়ে।

এই প্রথম সামান্য একটু হাসতে দেখা গেল লক্ষ্মীদিকে। বলল, হ্যাঁ কাউড়ে এখন বাজারে সবজি বিক্রি করে। খুব মদ খায়, বন্ধুত্বটা ঝালানোর দরকার নেই।

তাই? তা হবে। কিন্তু রুকুকে আমার মনে নেই। হরপ্রসন্নকাকা বললেন যে অল্প বয়সে মারা গেছে।

রুকু দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। তোমার সঙ্গে মানাত।

তাকে আমার মনে নেই, কারও কারও কাছে শুনেছিলাম, ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়ে আছে। তখন তো বিয়ের মানেই বুঝতাম না। ছেলেমেয়ের তফাতটাও না। আমাদের সঙ্গে মেয়েরাও খেলত, দেখে থাকব হয়তো।

তোমার মনে না থাকলেও রুকুর তোমাকে খুব মনে ছিল। তোমার কথা জিগ্যেস করত, কোথায় আছ, কী করছ।

আমার মনে হয় বাঙালি মেয়েদের কাছে বিয়ে জিনিসটা খুব ইমপর্ট্যান্ট।

সব মেয়ের কাছেই। তুমি বরং একটু হাঁটাহাঁটি করো। দরদালানটা খুব লম্বা। তোমার জন্য সেবা ফুলুরি ভাজছে।

ফুলুরি! বলে এক গাল হাসল মৃদুল, ফুলুরি আমার খুব প্রিয়। আপনি কিন্তু কথাটা এড়িয়ে গেলেন।

কোন কথাটা? মেয়েদের কাছে বিয়ে?

হ্যাঁ।

একটা মেয়ে, সে বাঙালিই হোক, মরাঠিই হোক, আমেরিকানই হোক, বিয়ে নিয়ে যতটা ভাবে ছেলেরা তত ভাবে না। কারণ মেয়েদের রিস্ক তো অনেক বেশি।

রিস্ক কি ছেলেদেরও নেই?

আছে, কিন্তু তুলনায় কম। এখন কিন্তু গল্প করার সময় নেই। রান্নাঘরে অনেক কাজ।

BanglaBook.org

আমি তো মোটে একটা লোক লক্ষ্মীদি, আমার জন্য এমনকী হাতিঘোড়া আয়োজন করছেন? আমার খাওয়ার কোনও বায়না নেই।

জমি-বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে তুমি তো আর কখনও আসবে না। তাই একটু যত্নআত্তি করছি। গাঁয়ের কথা তাহলে মনে থাকবে।

মনে রাখা, মনে পড়া এসবও কিন্তু মানুষের মস্ত দুর্বলতা। স্মৃতিচারণ নিষ্কর্মার লক্ষণ। কেজো মানুষরা অতীত নিয়ে ভাবতে বসে না। তাতে সম্মুখগতি কমে যায়।

ঠিক বলেছ, আমাদের সম্মুখগতি নেই।

দুই

দীননাথ মোট বাইশবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে লক্ষ্মীকে। গত বাইশ-তেইশ বছরের সম্পর্ক, বছরে একবার করে দাঁড়ায়। বাইশবারই নাকচ হয়েছে।

এই সন্ধের পরটায় আজও মদনের শুঁড়িখানায় এসে বসে দীননাথ। খাটুনি তার অমানুষিক। আগে শুধু এলআইসি করত। এখন শেয়ার থেকে মিউচুয়াল ফান্ড সব কিছুরই এজেন্সি তার। কাটোয়া, নবদ্বীপ, কেশনগর থেকে শুরু করে কাঁহা কাঁহা মুলুক চক্করবাজি করে বেড়াতে হয়। সন্ধের সময় শরীর মন দুই-ই ঝিমিয়ে পড়ে। তখন একটু-আধটু খেয়ে তাড়াগাড়া দিয়ে উঠত। একদিন, মাত্র একবারই লক্ষ্মী কঠিন চোখে চেয়ে শুধু বলেছিল, মদখোর লোক দু'চোখে দেখতে পারি না। সেদিন সন্ধে থেকে দীননাথ, মা কালীর দিব্যি, কখনও আর এক ফোঁটাও খায়নি। তাও বছর দশেক হতে চলল। কিন্তু সন্ধের পর এখানে একটু বসে। এখানকার বাতাসটা একটু শুঁকে যায়। তা শুঁড়িখানার বাতাসে মদের রেণু একটু ভাসে বইকি, আনচান করা গন্ধটুকুও কিন্তু ক্রিয়া করে, ছোলা-পেঁয়াজ-শশাকুচি আর ঝালবড়ার চাট খেতে তো বাধা নেই। তাই খায় কখনও-সখনও, কিছু গল্পসল্প হয়। তারপর আলো-আঁধারির পথ

BanglaBook.org

বেয়ে বাড়ি ফেরে। তিনটে বোনের বিয়ে নামিয়েছে একা দীননাথ। মায়ের ক্যানসারের চিকিৎসা করিয়েছে, যত দূর করা যায়। কিছু ফাঁক রাখেনি। বোম্বে অবধি নিয়ে গিয়েছিল। মরার আগে মা আশীর্বাদ বড় কম করেনি। তা আজকাল আশীর্বাদের আর জোর কী? তবে কর্তব্যকর্মে দীননাথের কখনও কোনও গাফিলতি ছিল না।

দীননাথের এই সাতচল্লিশ হল। লক্ষ্মীর সঙ্গে তার সম্পর্কটার শুরু বাইশ-তেইশ বছর আগে। লক্ষ্মী তখন সতেরো-আঠেরোর ডাগরটি, রোগাটে গড়ন, মুখেচোখে তীব্র ব্যক্তিত্ব ছিল ওই বয়সেই। এত ঝলমলে তীব্র চোখ সে কারও দেখেনি কখনও, আর ওই চোখই মেপে দেখে নিয়েছিল দীননাথকে। তারপর প্রবল একটা মাথা নাড়া দিয়ে শুধু বলেছিল, না। সেই না আজ অবধি আর হ্যাঁ হল না। হরজ্যাঠা বড্ড উদার মানুষ। তার এ প্রস্তাবে আপত্তি ছিল না, দু' পক্ষই চার ঘরের কায়স্থ, লতায়পাতায় জ্ঞাতিও বটে।

দীননাথ জানে, পুরুষেরা পলিগ্যামাস। সেটা কেতাবি কথা। হয়তো কথাটা মিথ্যেও নয়। কিন্তু দীননাথের মনের কম্পাস-কাঁটা সেই যে এক দিকে আটকে রইল আর কখনও অন্য কোনও মেয়ের দিকে ঘুরল না। এমনকী চোদ্দো-পনেরো বছর আগে লক্ষ্মী যখন বিপাকে পড়ল, তখনও দীননাথ বিমুখ হতে পারেনি। গাঁয়ে খুব রটনা হল, কলঙ্ক হল, জল্পনাকল্পনা হল, দীননাথকে সন্দেহ করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু সবাই তো জানে যে-কোনও অবস্থায় লক্ষ্মীকে গ্রহণ করতে পৃথিবীতে একমাত্র দীননাথই রাজি। না, সেই ঘটনার সঙ্গে দীননাথের সম্পর্ক নেই। আজ অবধি কখনও লক্ষ্মীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি সে।

কলঙ্ক হল বটে, কিন্তু লক্ষ্মী তবু সটান রইল, কারও চোখ থেকে চোখ সরানোর প্রয়োজন মনে করল না। হরজ্যাঠারও বটে বুকের পাটা। বাচ্চাটাকে জন্মাতে দিল। শুধু বলেছিল, জন্ম-মৃত্যুর কারণ আমরা নই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে আছে?

ঘটনাটা বড় দাগা দিয়েছিল দীননাথকে। কিন্তু ঘেন্না হল না, রাগও হল না। মানুষটার মূল্যও কমে গেল না এতটুকু। মনের কম্পাস-কাঁটা স্থির

BanglaBook.org

রইল, একটুও কাঁপল না। আর ওই দুঃসময়ে দীননাথ যখন প্রস্তাব দিয়েছিল, খুব ভয়ে ভয়ে দীনতার সঙ্গে, একই রকম মুখ ঝামড়ে মাথা নেড়ে লক্ষ্মী বলেছিল, না।

লক্ষ্মীর কাছে কখনও ও ব্যাপারে কোনও কথা জানতে চায়নি দীননাথ। তার দরকারও ছিল না। সে আপনা থেকেই জেনে গিয়েছিল। লক্ষ্মীকে যেমন কোনওদিন বলানো যায়নি, দীননাথও তেমনি কোনওদিন প্রকাশ করবে না। এই এক রহস্য, দীননাথ কোনও কিছু না জেনেও লক্ষ্মীর ওই গোপন কথা টের পেয়ে গেল।

এই আশি ঠেঙানো বয়সেও শিববাবু নিত্যদিনই এসে মদনের শুঁড়িখানায় বসেন। ব্যাপারটা বিস্ময়ের। চিন্তার কথাও। কারণ, গেলাসে দু'-চারটে চুমুক দিতে না দিতেই তার ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। হেঁচে, কেশে, হেঁচকি তুলে, নাল-ঝোল ফেলে একশা কাণ্ড। ওদিকে পেচ্ছাপ বেরিয়ে কাপড় নষ্ট। আজও ওই বসে আছেন। প্রথমটায় বেশ ঠান্ডা গলাতেই বললেন, দীনু নাকি রে? এখানে আলো এত কম যে, মুখখানা ঝাপসা দেখছি।

দীনুই বটি জ্যাঠা।

তোর কী হবে বল তো দীনু! বিয়ে বসলি না, তোর মুখাগ্নিই বা করবে কে, শ্রাদ্ধশান্তিরই বা কী ব্যবস্থা হবে! এক জায়গায় আটকে থাকলে কি চলে বাপু! পুরুষ মানুষ হল বাপ কা ব্যাটা। তোর অভাবটা কীসের? ভগবান শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো তো এমনি এমনি দেননি, তা কাজেই লাগালি না বাপ।

গাঁয়ে এই এক ল্যাঠা। বেশি বয়সের মানুষেরা গার্জিয়ান দাঁড়িয়ে যায়। তবে নিয়মটা একটু একটু করে ভাঙছে। আগে অল্পবয়সিরা বয়সিদের সামনে খেত না। লুকিয়ে-চুরিয়ে খেত। আজকাল সামনেই খাচ্ছে, তেমন গ্রাহ্য করছে না। ওই তো শিবুজ্যাঠার পাশে কাহারপাড়ার নবু বসে গেছে গেলাস হাতে।

একটু খেতে রোজই ইচ্ছে যায়। শরীরটা আঁকপাঁক করে। গত দশ বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দীননাথ। তবে এর কোনও পুরস্কার নেই,

BanglaBook.org

বাহবা নেই, কেউ অবাক হয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকবে না অহঙ্কারের সঙ্গে। লক্ষ্মী ভাল করে চোখে চোখ রেখে তাকালই না কোনওদিন। ভাল মুখে কথাও কি বলেছে!

বলি কী, এক পাত্তর টেনে নে। বুকে বল পাবি। তারপর ঝাঁকি দিয়ে হাঁকার মেরে ওঠ তো বাপ। মিনমিন করিস বলেই তো ফসকে যায়। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে দরজার খিল তুলে দে—

দীননাথ উঠে পড়ল। আর বসে থাকা বিপজ্জনক। কোথাকার কথা কোথায় গড়াবে কে জানে। বুড়োদের জিভে তো কিছু আটকায় না। পেটে মদ গেলে আদিরসের গ্যাঁজলা বেরোতে থাকে।

কোনওদিন বেশি কথা বলেনি লক্ষ্মী। খুব বেশি হলে একটা-দুটো বাক্যি। উপেক্ষা আছে, অপছন্দ আছে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য আছে, অপমান আছে, প্রত্যাখ্যান আছে। তবু কী জাদুবলে টেনে রেখেছে তাকে। আজও তার ওই একজনকে ঘিরে ক্রমান্বয় প্রদক্ষিণ শেষ হল না। সাতপাক দূরের কথা, কত হাজার পাক হয়ে গেল, তবু বাঁধনই পড়ল না কোনও।

একবার, মাত্র একবারই, পুজোর সময় একখানা শাড়ি এনেছিল সেই বিষ্ণুপুর থেকে। তাঁতির মোকামের সূক্ষ্ম রেশম। কী রাগ শাড়ি দেখে!

কেন এনেছ?

এমনি। পুজোর সময়টা তো।

আমার লাগবে না।

এনে ফেলেছি, এই শেষবার। আর না হয়—

ফেলে দাও গে। আমার অনেক শাড়ি আছে।

এবারটা না হয়—

না। কিছুতেই না।

বছর দুই আগে একটা সেলফোন এনেছিল দীননাথ।

নেবে?

কেন? আমার তো দরকার নেই।

ইমার্জেন্সিতে দরকার হতেও তো পারে।

না। ওসব আমার দরকার হয় না।

BanglaBook.org

শখ করে আনলাম, না হয় ফেলেই রাখবে।

আমাদের বাড়িটা আস্তাকুঁড় নয়। ও নিয়ে যাও।

কোনওদিন কিছু নিল না লক্ষ্মী। তবে প্রদ্যুম্নকে তেমন বাধা দেয়নি কেন কে জানে। ছেলেটা শিশুকাল থেকে কোন আশ্চর্য কার্যকারণে দীননাথের ভীষণ ন্যাওটা। যখন কথা ফোটেনি তখন থেকেই তাকে দেখলে কোলে আসার জন্য ঝাঁপ খেয়ে পড়ত। অবসর পেলেই দীননাথ গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত এধার-সেধার। ওই একটা ব্যাপারে কখনও বাধা দেয়নি ওর মা। দীননাথ প্রদ্যুম্ন তথা বিলুকে সাঁতার শিখিয়েছে, সাইকেল শিখিয়েছে, ক্রিকেট শিখিয়েছে, যোগাসন শিখিয়েছে। বিলু এখনও তার ন্যাওটা। বিলুকে এক-আধটা খেলনা দিলে লক্ষ্মী রাগ করত বটে, কিন্তু তেমন ঝাঁঝালো রাগ নয় কিংবা ফিরিয়েও দেয়নি কখনও। আর দীননাথও বাড়াবাড়ি করেনি কখনও।

তারপর এল ইস্কুলের সমস্যা। বাবার নাম ছাড়া গাঁয়ের স্কুলে ভরতি করার সমস্যা হল। এ গাঁ এবং আশেপাশে কয়েকটা গ্রামে দীননাথের কিছু রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু অনুরোধটাই কখনও করল না লক্ষ্মী।

হরপ্রসন্নও তাঁর মেয়ের মতোই। কখনও কোনও আপসরফা নেই, কোনও কাজ বাগানোর জন্য ধরাকরা নেই, কারও দয়াদাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা নেই। এই দুই নির্বিকার এবং শক্ত ধাতের মানুষের পাল্লায় পড়ে বিলুর পড়াশুনোর বারোটা বাজার জোগাড়। দীননাথ তখন বাধ্য হয়েই একদিন লক্ষ্মীকে বলল, দেবীপুর ইস্কুলে ভরতি নেবে।

বাবার নাম কী বলবে?

আসল নামই বলব।

লক্ষ্মী একটা ঝটকা মেরে মুখ তুলে বিদ্যুৎগর্ভ চোখে চাইল। সেদিন চোখ সরায়নি দীননাথ। আশ্চর্য এই, লক্ষ্মী আর একটি কথাও বলেনি। চোখ নামিয়ে কাঁচি দিয়ে যেমন কাপড় কাটছিল তেমনি কাটতে লাগল।

তোমার অনুমতিটা তো চাই।

যা খুশি করো। আমি কিছু জানি না।

BanglaBook.org

দেবীপুর একটু দূরে। কথাটা যদি এত দূর গড়িয়ে আসেও তাতেই বা ক্ষতি কী? একটু জানাজানি হবে, এই যা। তবে দেবীপুর স্কুলের হেডমাস্টার সরল বাঁড়ুজ্জে তার বন্ধু মানুষ। সে সব শুনে বলল, আপাতত বাবার নাম রেকর্ডের বাইরে রাখা শক্ত হবে না। একটু রিস্ক আছে, তবে সামলানো যাবে। কিন্তু মাধ্যমিকের ফর্ম ফিল আপের সময় কিছু করার থাকবে না।

ওটুকু করলেই যথেষ্ট। স্কুলের রেকর্ডে নামটা থাকলে প্রচার হওয়ার সম্ভাবনা।

আমি যতদিন আছি ততদিন ভয় নেই। কিন্তু আমি যদি বাই চান্স চাকরি ছেড়ে দিই বা মারাটারা যাই তাহলে অন্য কথা।

একটা রহস্যই বুঝতে পারল না দীননাথ । কুমারী অবস্থায় মা হল লক্ষ্মী, এবং তার জন্য লোকলজ্জা বা আত্মগ্লানিকে পাত্তা দিল না। হরজ্যাঠাও যেন সরলকাণ্ড বৃক্ষের মতোই অটল রইলেন। এতটাই যদি তাঁরা অকপট তবে বিলুর বাবার নামটা প্রচার করতে আপত্তি কীসের? লোকটার একটা শিক্ষা হওয়ারও তো দরকার ছিল!

হরজ্যাঠাকে জিজ্ঞেসও করেছিল, হরজ্যাঠা বললেন, আমি জানি না বাবা। লক্ষ্মী প্রকাশ করবে না, আমার কাছেও করেনি। চাপাচাপি করে তো লাভ হয় না।

কিছুদিন যাতায়াত করেছিল বিলু। কিন্তু দেবীপুর অনেকটা রাস্তা। গাঁ-গঞ্জে যাতায়াত তো সহজ নয়। তিন-চার বছর হল হস্টেলে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে।

একটা বিষয় নিয়ে মানুষ বহু দিন কচলাতে পারে না। প্রায় চোদ্দো-পনেরো বছর আগেকার এই ঘটনা নিয়ে তাই এখন আর কোনও গুঞ্জন নেই। পুরনো আমলের কিছু লোক মারাও গেছে। নতুন প্রজন্ম আসছে। গ্রামের ছিরিছাঁদ, জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি পালটাচ্ছে। ঘটনাটাও ফিকে হয়ে আসছে ক্রমে।

জ্যোৎস্নায় একা বাড়ি ফিরছিল দীননাথ। রাত হয়েছে। পথঘাট ভারী নির্জন। একটা কথা আজকাল তার খুব মনে হয়। বুড়ো বয়সে তার খুব

BanglaBook.org

কষ্ট হবে। ব্যাচেলরদের ওই কষ্ট থেকে রেহাই নেই। একটু বায়ুগ্রস্ততাও পেয়ে বসতে থাকে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথা কয়ে ফেলবে, বাইবাতিকে ধরবে। নিঃসঙ্গতা মানুষের এক ভয়ংকর শত্রু। তার জন্য তৈরি হওয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে তৈরি হবে? কোনও স্কুলে তো এসব পড়ানো হয় না।

রায়বাড়ির ফটকের কাছ বরাবর চমকটা অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

এই ফিরলে?

দীননাথ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, হ্যাঁ। এখনও বাড়ি যাওনি?

এবার যাব।

অতিথি আপ্যায়ন কেমন হল?

অতিথি আবার কীসের! জ্যাঠামশাই মাথায় একটা দায় চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, এবার তার থেকে রেহাই।

বাড়ি বিক্রি ঠিক হয়ে গেল বুঝি!

না। আজই তো সবে এল।

দীননাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একটা পরিবারের পাট উঠে গেল গাঁ থেকে। মৃদুল আমার জ্ঞাতিভাইও বটে। দেখাসাক্ষাৎ নেই, এই যা।

আমার টাকা থাকলে বাড়িটা কিনে নিতাম।

তুমি! এত বড় বাড়ি দিয়ে তোমার কী হবে? তোমাদের নিজেদের বাড়িতেই তো চার-পাঁচখানা ঘর হাঁ হাঁ করছে। থাকবে কে?

বাড়ি মানেই কি শুধু থাকা! কিনে রাখতাম এমনিই। একটা খেলনা বলতে পারো।

দীননাথ হাসল। এত কথা কখনও বলে না লক্ষ্মী তার সঙ্গে। আজ কেন বলছে কে জানে!

বাড়ি যাও। হিম পড়ছে।

হাতের টর্চটা খেলাচ্ছলে জ্বেলে এদিক-ওদিক বারকয়েক ফেলল লক্ষ্মী। হঠাৎ বলল, এটা সাপেদের ঘুমের সময়, না?

এখনও হাইবারনেশন পিরিয়ড শুরু হয়নি। তবে বেশি দেরিও নেই।

BanglaBook.org

হঠাৎ সাপের কথা কেন? বেরিয়েছিল নাকি?

পরশু দুপুরে উঠোন বেয়ে যাচ্ছিল একটা। আজকাল বেশি দেখা যায় না, না?

না। সাপ কমে যাচ্ছে। তোমাকে এগিয়ে দেব কি একটু?

আশঙ্কা করেছিল, লক্ষ্মী নিয়মমতো ঝটকা মেরে বলবে, না। কিন্তু বলল না। বরং বলল, চলো।

পথ বেশি নয়। ফুরিয়ে যাবে টক করে। লক্ষ্মী খুব ধীর পায়ে হাঁটছিল, পাশাপাশি তাল রেখে দীননাথ।

কেন বাড়িটার জন্য কষ্ট হচ্ছে বলো তো!

দীননাথ বেশ অবাক। এসব তো ভাবের কথা! লক্ষ্মী তো ভাবের মানুষ নয়! তবু সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক আন্তরিক গলায় বলে, কেন?

যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে ওই বাড়িটাকে আমার নিজের বাড়ি বলে মনে হত। তার কারণ জানি না। ও বাড়িতে আমার কাছাকাছি বয়সের অনেক খেলুড়ি ছিল তখন। কোন খেলায় কে জানে, আমাকে একবার রানি সাজানো হয়েছিল। কী ভাল যে লেগেছিল সেদিন নিজেকে রানি ভাবতে। তারপর একদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে বাড়ির ছাদে পরিটা নামল।

পরি?

হ্যাঁ। ভুল দেখিনি। তখন আমার তেরো বছর বয়স। ওদের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খেয়ে ফিরছিলাম। একটু রাত হয়েছিল। তখন দেখলাম। খানিকক্ষণ উড়ে বেড়াল চারদিকে। তারপর ঝুপ করে নামল।

হঠাৎ দীননাথের সন্দেহ হল, লক্ষ্মী তার সঙ্গে কথা বলছে না। দীননাথ যে পাশে আছে সেটা ভুলেই গেছে। সে এখন কথা বলছে অন্য কারও সঙ্গে, হয়তো তার নিজের সঙ্গেই। দীননাথ সতর্কতার সঙ্গে চুপ করে রইল।

লক্ষ্মী একবার থেমে মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল, তারপর মৃদু গুঞ্জরণে বলল, ওই পুবের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে ছিল।

BanglaBook.org

খুব ভয় হয়েছিল আমার। শান্তদার বন্দুক আছে। পাখি মেরে বেড়ায়। যদি পরিকে পাখি মনে করে মারে!

দু'পা পিছিয়ে গেল দীননাথ। একা একা কথা বলুক। বুকটা হালকা হোক। সুমুখে চাঁদ। লক্ষ্মীর ছায়ার সঙ্গে তার ছায়া বারবার মিলেমিশে যাচ্ছে। আজ অবধি অঙ্গ স্পর্শ হয়নি তাদের। শুধু দু'জনের ছায়ার বড় জড়ামড়ি আজ।

এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে লক্ষ্মী। চারদিকে এক অলীক ঘিরে আছে তাকে। এ জগতে নেই বুঝি সে এখন। শুধু তার দেহগন্ধ পায় দীননাথ। এ গন্ধ আর কেউ পায় না কখনও, শুধু দীননাথ পায়। বড় মাদক, বড় পাগল-করা গন্ধ। মোহ আসে, জন্মান্তর দরজা খুলে দেয়।

একটু আগুপিছু হয়ে যেন কতকাল ধরে হেঁটে গেল তারা। লক্ষ বছর, লক্ষ লক্ষ মাইল। দোরগোড়ায় পৌঁছে লক্ষ্মী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি এখন যাও।

যাব?

হ্যাঁ। রাত হয়েছে।

হরজ্যাঠা দাওয়া থেকে গলা তুলে বলল, কে রে? ও লক্ষ্মী, তোর সঙ্গে কে? দীনু নাকি?

হ্যাঁ বাবা।

ডাক দীনুকে।

এত রাতে দীনুকে আবার তোমার কী দরকার?

কথা আছে। রাত বেশি হয়নি। মোটে ন'টা। আয় দীনু, বোস।

দীনু দাওয়ায় উঠে তক্তপোশে বসল।

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবি বুঝলি দীনু! কোথাও কোনও অকর্তব্য রয়ে গেল কি না। মনটা বড় খুঁতখুঁত করে। আজকাল ভুলেও যাই বড্ড। তোর তো হিসেবের মাথা, ওকালতিও পাস। কাগজপত্তরগুলো দেখে দিবি নাকি?

কাগজপত্র আপনার সব ঠিকই আছে। দেখার কিছু নেই।

BanglaBook.org

গোবিন্দদার দায় এতকাল বইলুম তো, এবার দায় নামবে। লগ্নি যা করা আছে সব ভেঙেটেঙে এইবার গোবিন্দদার ভাইপোকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনও গোলমাল থাকলে হবে না। এক ফাঁকে এসে সব বুঝে-সুঝে নিয়ে যাস।

আমিই তো ইনভেস্ট করেছি। হিসেব আমার কাছেও আছে। ও নিয়ে ভাববেন না, পাই পয়সার গোলমাল হবে না।

তুই বড় ভাল ছেলে। আমার হিসেবে দশ বছর ধান, সবজি আর আমবাগান দরুন বারো-চোদ্দো লাখ টাকার বেশিই হয়েছে, কী বলিস?

দেখতে হবে জ্যাঠা, মিউচুয়াল ফান্ডে তেজি-মন্দা আছে। কী দাঁড়িয়েছে হিসেব করে দেখব' খন।

ছোকরার নাকি খুব টাকার দরকার। কেন দরকার কে জানে। ও তো টাকারই দেশ। সেখান থেকে কেউ অভাব নিয়ে এদেশে আসে!

সকলেরই কি আর হয় জ্যাঠা। মৃদুল তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। তারপর খোরপোষের মামলাতে ফেঁসে গেছে।

তুই এত জানলি কী করে?

বছর কয়েক আগে আপনিই আমাকে বলেছিলেন, এদিককার বিলি ব্যবস্থার কথা ওদের জানাতে। নইলে হয়তো ভাববে যে পাঁচভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে। তাই আমি প্রতুলকে ফোন করে সব জানাই। তখন প্রতুলই বলেছিল মৃদুল তেমন সুবিধে করতে পেরে উঠছে না।

তাহলে পড়েই বা আছে কেন সেখানে!

মায়া মোহ বলেও তো কথা আছে। আপনিই পারলেন বর্ধমানে গিয়ে থাকতে? সেটলমেন্ট অফিসের চাকরিটা তো খারাপ ছিল না।

সে বৃত্তান্ত আলাদা। আমি পেটরোগা মানুষ, বর্ধমানের জল সহ্য হল না কি না।

শুনলে লোকে হাসবে। বর্ধমানের জল মোটেই খারাপ নয়। বরাবর কি পেটের দোহাই চলে!

হরপ্রসন্ন একটু প্রসন্ন হেসে বলেন, পিছুটান ছিল না বলছি না, সেও ছিল একটু।

BanglaBook.org

এক কাপ চা নিয়ে এল লক্ষ্মী।

এই যে, চা!

বাড়ি এলে এটুকু ভদ্রতা লক্ষ্মী করে। চা দিয়ে দাওয়ার সিঁড়িতে বসল। বাঁ হাতে কাচের গেলাসে নিজেও চা নিয়েছে একটু।

কী কথা হচ্ছিল?

দীনু বলল, বিষয়-সম্পত্তির কথা।

দু'জনে একজোট হলেই তোমাদের কেবল ওসব কথা হয় কেন? কেবল শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড, লং টার্ম, শর্ট টার্ম। কী রস পাও ওতে?

হরপ্রসন্ন বলেন, ও তুই বুঝবি না। পরের টাকা আগলে থাকা একটা বড় ঝকমারি। হিসেবের গোলমাল হলে লজ্জার শেষ থাকবে না।

দীনু চা খেতে খেতে বলল, এত কেউ করে না জ্যাঠা। ওদের কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বুঝবে, এসব ওদের পাওনা ছিল না।

লক্ষ্মী বলল, বহুবচনে বলছ কেন? ওরা আবার কারা। মাত্র তো একজন ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছে।

দীনু বলল, না, একজন নয়।

তাহলে?

ঠিকমতো হিসেব করলে তিনজন তো বটেই। প্রতুলের বউ বা মেয়েকে ধরছি না। ওরা এই সম্পত্তির খবরও রাখে না, পরোয়াও হয়তো করে না। যদিও বিধিসম্মতভাবে ওদেরও ভাগ আছে। ওদের বাদ দিলেও পুতুলপিসির ছেলে বর্তমান, আর নগেনকাকার বউ।

লক্ষ্মী অবাক হয়ে বলে, পুতুলপিসি তো মারা গেছে! নগেনকাকার বউয়ের তো অনেক বয়স। বেঁচে আছে কি না কে জানে!

আইনে মেয়েদের সমান ভাগ। পুতুলপিসি অল্প বয়সে মারা গেলেও তার ছেলেটা আছে। কেউ তাদের খবর রাখে না বটে, কিন্তু ভাগ আছে। নগেনকাকার বউ পঁচিশ বছর ধরে বিধবা। বাপের ভিটেয় পড়ে আছে। কিন্তু আইনত তারও দাবি আছে।

মৃদুল কিন্তু এসব জানে না।

BanglaBook.org

না জানলে জানিয়ে দেওয়া দরকার। ভাগীদারদের অজ্ঞাতে জমি বাড়ি বিক্রি করা কিন্তু বে-আইনি। কম করেও পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকার সম্পত্তি। ফসল আর বাগানের ইজারা মিলিয়ে বছরে দু'-আড়াই লাখ টাকা আসে। এসব টাকা হরজ্যাঠা আমার কাছেই ইনভেস্ট করতে দেয়। মিউচুয়াল ফান্ড আর শেয়ারে খাটাই। কিছু বন্ডও কেনা আছে। হরজ্যাঠার অত হিসেব নেই। সব ধরলে নগদেই ত্রিশ লাখ টাকার কাছাকাছি হবে।

লক্ষ্মী হঠাৎ এক ঝাঁকিতে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝের গলায় বলল, তোমারই বা অন্যের সম্পত্তি নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কী দরকার বলো তো দীনুদা! দিনরাত টাকাপয়সার কথা কী করে ভাবে একটা মানুষ! বলে এঁটো কাপটা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

এই চমকা রাগ দেখে একটুও অবাক হল না দীননাথ। লক্ষ্মীকে ঠিক এরকমই মানায়। সে একটু হাসল মাত্র।

হরপ্রসন্ন বললেন, ও বাবা, এসব আমারও খেয়াল ছিল না রে দীনু। গোবিন্দদাও তো কিছু বলেনি কখনও।

আইনের অন্ধি-সন্ধি অনেকের জানা নেই কি না।

তুই ওদের খবর রাখিস?

রাখি। পুতুলপিসির ছেলে নিতু ইস্কুলমাস্টার। হুগলিতে থাকে। তার যে কোনও সম্পত্তির ভাগ পাওনা আছে এটা সে জানেই না। কালীশশী খুড়িমা কষ্টে আছে। বুড়ো বয়সেও কাজ করে খেতে হয়। ভাইয়ের সংসারে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজ। বুদ্ধিসুদ্ধিও কম। গাঁ-ঘরের মেয়ে তো! নইলে শ্বশুরবাড়িতে এসে নিজের দাবিদাওয়া আদায় করে নিত। তা ভয়েই মরে।

তবু তো ন্যায্য দাবিদার। কিন্তু আমি ভাবছি এসব কথা তুললে আবার অন্য রকম মানে বেরোবে না তো!

তা আর কী করা যাবে। আপনারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমার কর্তব্য ছিল কথাগুলো আপনাকে জানানো। মৃদুল যদি জেনেও ভাগ দিতে না চায় তো দেবে না।

BanglaBook.org

দাঁড়া, ভেবে দেখি। এই বয়সেও আমার বুকের পাটা হল না রে। কত কথা বলা উচিত বলে মনে হলেও শেষ অবধি বলে উঠতে পারি না। তবু বলে ভাল করেছিস। কালীশশীর কথা মনেই ছিল না, আর নিতু নামে যে কেউ আছে তাই তো জানতুম না। তুই অনেক খবর রাখিস।

দরজায় এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল লক্ষ্মী। মুখ ঝামড়ে বলল, তা রাখবে না! দিনরাত তো আলায়-বালায় ঘুরে ঘুরে পাবলিক রিলেশন করে বেড়াচ্ছে!

দীননাথ একটু হেসে উঠে দাড়াল। বলল, জ্যাঠা, লক্ষ্মী কিন্তু চায় না যে বাড়িটা বিক্রি হয়ে অন্য কারও হাতে যাক। আমাকে বলেছে, টাকা থাকলে ও নিজেই কিনে নিত।

তিন

বিমোহন দত্ত ও চন্দ্রমণি দত্তের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে খুবই ভাবসাব। অনেক সময়েই তারা গায়ে গায়ে চলে। শীতকালের কবোষ্ণ রোদে এমনও দেখা যায় যে চন্দ্রমণি উঠোনের কোণে বিমোহনের বুক ঘেঁষে শুয়ে আরামে চোখ বুজে আছে। চন্দ্রমণির বেয়াদবি দেখলে বিমোহন পুরুষোচিত ধমকচমক করে, আর বিমোহনকেও চন্দ্রমণি মাঝে মাঝে কথা শোনাতে ছাড়ে না। এত ভাব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষোচিত কোনও প্রেম নেই। স্বভাবেও বিস্তর পার্থক্য। বিমোহন দত্তের পুরুষোচিত গাম্ভীর্য এবং সংযম আছে। চন্দ্রমণির স্বভাব কিছু তরল। সে পাড়া বেড়াতে ভালবাসে এবং যার-তার সঙ্গে মেলামেশা করে। আর এই জন্যই দত্তবাড়িতে চন্দ্রমণির ওপর অনেকেই অসন্তুষ্ট। কিছুকাল আগেও তাকে মিস চন্দ্রমণি দত্ত বলে উল্লেখ করা হত। সম্প্রতি সে গুটি চারেক অপ্রত্যাশিত শাবক প্রসব করায় তার মিস অভিধা ঘুচে গেছে। তার এই ছেনালিপনায় বিশেষ অখুশি নীপবীথি ওরফে নীপা। সে খুব ভাল সোর্সে খবর পেয়েছে চন্দ্রমণি কালু

BanglaBook.org

লোহারদের ঘোর কালো হুলোটার সঙ্গে মেলামেশা করে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। তার ইচ্ছে ছিল চন্দ্রমণি পিকুদের ভদ্র সভ্য ও সুদর্শন হুলোর সঙ্গে ডেটিং করুক। কিন্তু চন্দ্রমণির নজর বড় নিচু। পাড়ায় মাছ-চোর বলে তার বদনাম আছে। অথচ বাড়িতে চন্দ্রমণি রোজ মাছভাত খায়, তবু তার স্বভাব শোধরাল না। বাচ্চা হওয়ার পর নীপা রাগ করে চন্দ্রমণির পদবি পালটে লোহার করে দিয়েছিল। যথেষ্ট রাগ করেই বলেছিল, যেমন লোহারদের হুলোর সঙ্গে মিশিস তেমনই উচিত শিক্ষা হয়েছে। এখন থেকে তোকে সবাই মিসেস লোহার বলে ডাকবে।

বাড়ির কর্তা বিলোচন দত্ত অতিশয় ব্যস্ত মানুষ। গাঁ থেকে দু' মাইল দূরে তার কোল্ড স্টোরেজ। কাছাকাছি আরও একটা তৈরি হচ্ছে। ব্যাপক ব্যবসা নিয়ে বিলোচন বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। বাড়িতে তাকে পাওয়াই যায় না। ফলে এই বড় সংসারটা সামাল দিতে হয় শশীমুখীকে। ফলে শশীমুখী সারা দিন সকাল থেকে সন্ধে দশখানা হয়ে সারা বাড়িতে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। যে দিকে সে নজর না দেবে সেদিকেই বে-গোছ।

চন্দ্রমণির যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকত তাহলে কি সব জায়গা ছেড়ে সুধাপানির খাটের তলায় এসে বাচ্চা বিয়োত? সুধাপানি শুদ্ধাচারী বিধবা। হেগেমুতে তার খাটের তলাটা অনাছিস্টি না করলেই নয়?

ভাগবদগীতাখানা সুধাপানির প্রায় মুখস্থ। সংস্কৃততে বাপের কাছ থেকে প্রথম পাঠ পেয়ে অবধি সেই কৈশোরকাল থেকে গীতা পড়ে আসছেন, আশি ছুঁই ছুঁই বয়স অবধি টানা এক খেপে ভোর পাঁচটা থেকে উঁচু গলায় পাঠ করে তবে জলগ্রহণ করেন। হালে ছানি পড়েছিল, তাতেও আটকায়নি। গীতা খুলে মুখস্থ বলে যেতেন। মাসটাক আগে ছানি কাটিয়ে এখন আরও উৎসাহ বেড়েছে। গলা আরও উঁচুতে উঠেছে। কিন্তু পাঠ করবেন কী, শুরু করতে না করতেই খাটের তলা থেকে চার চারটে বিড়ালছানা এমন কিঁউ কিঁউ করে মড়াকান্না জুড়ে দেয় যে, তাতে গীতা চাপা পড়ার জোগাড়। তারপর সারা দিন কিঁউ কিঁউ আর থামা নেই। ছেনাল এবং বারমুখো চন্দ্রমণি তেমন মা নয়। খিদে পেলে বাচ্চারা তো কাঁদবেই, কিন্তু চন্দ্রমণির কি আর সেদিকে হুঁশ

BanglaBook.org

আছে? বেহান হতে না হতে সে পাড়া টহল দিয়ে ফস্টিনস্টি করতে সেই যে বেরিয়ে যায় বাচ্চাগুলো হেঁদিয়ে পড়লেও তার টিকিটির দেখা নেই।

আজ সকাল থেকে তাই চন্দ্রমণির বিষ ঝাড়ছে শশীমুখী। তার সব রাগই শেষ অবধি গিয়ে পড়ে অনুপস্থিত বিলোচনের ওপরে। স্বামী ছাড়া মেয়েরা আর চিবোনোর হাড় পাবে কোথা?

সুধাপানির সেকেলে বিশাল খাটের তলায় রাজ্যের হাঁড়িকুঁড়ি আর বাক্স-প্যাঁটরা গায়ে গায়ে এমন জমাট বেঁধে আছে যে বাঘ লুকিয়ে থাকলেও হদিশ পাওয়ার জো নেই। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে শশীমুখী উবু হয়ে খাটের তলাটা দেখার চেষ্টা করতে করতে বলছিল, আশকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে বুঝলেন মা! আহ্লাদ করে আবার নাম রাখা হয়েছে চন্দ্রমণি। বেড়ালের চন্দ্রমণি নাম কখনও শুনেছেন মা? আবার নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কুকুরের নাম রাখা হয়েছে বিমোহন দত্ত! শুনে লোকে হাসে আর আমি লজ্জায় মরি। খরগোশের নাম বিমুখ আর বিন্ধ্যবাসিনী। তা এত আশকারা পেলে মাথায় উঠবেই বা না কেন? তাও যদি ভাল স্বভাবের বেড়াল হত। কালকেও নবদের নতুন জামাইয়ের পাত থেকে পাবদা মাছ তুলে এনেছে। কী নোলা বাবা!

সুধাপানি লাল মলাটের গীতাখানা কপালে ঠেকিয়ে বালিশের পাশে রেখে বললেন, আশকারা কেউ কম দেয় না বাছা। ওই তো নিঘিন্নে জীব হেগে ছোঁচায় না, খেয়ে আঁচায় না, তাকে বিছানায় পাশ ঘেঁষে নিয়ে শুয়ে থাকা কি ভাল মা? তার ওপর বিন্দির মুখে শুনি প্রায়ই নিজের পাতের মাছ তুলে দাও তাকে। এ বাড়িতে কি শুদ্ধাচার বলে কিছু আছে।

শশীমুখীর মুখে কুলুপ। টর্চ মেরে ছানাগুলোর কোনও হদিশ না পেয়ে বলল, গাভীন অবস্থা দেখে সেই কবে লাকরির ঘরের বারান্দা ঘিরে দিয়েছি, খড় আর বস্তা পেতে বিছানা করে রেখেছি, তা সেসব পছন্দ হল না আবাগির বেটির। বিয়োতে এলেন এই ঘরে!

যা করে ফেলেছে তা তো করেই ফেলেছে। এখন ঠাঁইনাড়া করার দরকার নেই বাছা। লাকরির ঘরের বারান্দা বড় ভাল জায়গা তো নয়।

BanglaBook.org

শেয়ালে এসে কুশি কুশি ছানা ধরে নিয়ে যাবে। শত হলেও ষষ্ঠীর বাহন।

শশীমুখী গজগজ করতে লাগল, একখানা ছিল, পাঁচখানা হল। এখন এই পাঁচজন কী কাণ্ড করে তাই ভাবি। ক'টা মদ্দা ক'টা মাদি কে জানে। মাদিগুলো দেখ না দেখ বড় হয়ে ফের বিয়োতে শুরু করবে। টেকা যাবে বাড়িতে?

কিছু পার করে দিলেই তো হয়।

দেবে আপনার ছেলে পার করতে? কুকুর, বেড়াল, কাকপক্ষীর জন্যও কত দরদ। তার শত ভাগ যদি আমার জন্য থাকত। সাতসকালে গিয়ে ঠান্ডা ঘরে সেঁধিয়েছেন। যত জ্বালা তো আমার।

পাঁচ ব্যাটারির টর্চখানা শাশুড়ির জিম্মায় রেখে শশীমুখী ছুটল ভিখিরি বিদায় করতে।

বিমোহন অতি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কুকুর। এ বাড়িতে মোট সতেরোজন বাঁধা ভিখিরি আছে। সবাই রোজ আসে না। যে যখনই আসুক না কেন বিমোহন তাদের কখনও বকাঝকা করে না। শুধু উঠোন পেরিয়ে যাতে ভিতরবাগে না আসে তার জন্য খাপ পেতে পাহারা দেয়।

আকাশটাকে আজ চৌকো চৌকো করে কেটে নানান রঙের ঘুড়ি উড়ছে। এক দুই করে গুনে দেখল নীপা, বিয়াল্লিশটা। একটা লাল-কালো ঘুড়ি এত ওপরে উঠে গেছে যে অদৃশ্য হয়ে যাবে বুঝি। শান্তি বলল, ওই চাঁদিয়ালটা দেখছিস, ওটা আমার দাদা ওড়াচ্ছে। সবাইকে কেটে দেবে দেখিস।

নীচে হঠাৎ বিমোহনের গম্ভীর গলার ধমক-চমক শোনা গেল। শান্তি দৌড়ে গিয়ে রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখে বলল, এই নীপা, দেখে যা, তোদের বাড়িতে আজ একটা নতুন ভিখিরি এসেছে।

যাঃ, সত্যি!

নীপা গিয়ে দেখল, সত্যিই নতুন ভিখিরি। দাড়িওয়ালা মাঝবয়সি, নেড়া মাথা। তার সঙ্গে ল্যাংড়া রামুয়া।

শশীমুখী ঝংকার দিয়ে বলল, ওটা কাকে জুটিয়ে এনেছিস রে রেমো।

ভাতিজা আছে মাইজি।

BanglaBook.org

ভাইপো! তাকে আবার ভিখিরি বানানোর কী? কানাও নয়, খোঁড়াও নয়, কাজ করে খেতে পারে না?

কাম-কাজ কৌন করবে মাইজি? আমরা ভিখমাঙ্গা আছি সবকোই, বাপ দাদাভি ছিল। ওইরকমই দস্তুর আছে।

আ মোলো! বলে গজগজ করতে করতে শশীমুখী ভিক্ষে দিয়ে ছুটল রান্নাঘরে, এ বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই। রান্নার লোক, কুটনো কোটার লোক, বাটনা বাটার লোক, বাসন মাজার লোক, গোরু দুইবার লোক। তবু শশীমুখী সারা দিন ছোটাছুটি করে হা-হয়রান হচ্ছে। সব কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়া শশীমুখীর স্বভাব।

দেখ নীপা, রায়বাড়িতে ছাদে একটা লোক ঘুড়ি ওড়াচ্ছে!

যাঃ! রায়বাড়িতে আবার ঘুড়ি ওড়াবার কে আছে?

পষ্ট দেখলুম। আমগাছটার আড়ালে পড়েছে। তাকিয়ে থাক, দেখতে পাবি।

রায়বাড়ির ছাদ গাছপালায় অনেকটাই আড়াল। ফাঁকফোকর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল নীপা। তারপর দেখতেও পেল। ফরসা, লম্বামতো। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি।

কে রে লোকটা?

কে জানে! আমেরিকা থেকে ছেলেরা কেউ এসেছে বোধহয়। বাবা বলছিল রায়বাড়ি নাকি বিক্রি হবে।

ও বাড়িতে ভূত আছে, জানিস?

জানি। মঞ্চাদা তো বলে, রোজ রাতে নাকি ছাদে ধুপধাপ শব্দ হয়।

নেহা বলে, নিশুতি জ্যোৎস্না রাতে নাকি একটা মেয়ে এলোচুলে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীপা শিউরে উঠে বলে, মাগো! কোনওদিন দেখলে আমি হার্টফেল করে মরেই যাব।

তুই না ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছিস! তোর আবার ভূতের ভয় কী?

দুর বোকা! ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে বুঝি ভূতের ভয় থাকে না?

তাই তো শুনি।

BanglaBook.org

ভ্যাট। আমার তো বাবা ভীষণ ভূতের ভয়।

এ বাড়ির পুষ্যি অনেক। কুকুর, বেড়াল, পাখি, খরগোশ যেমন, তেমনই আবার নিষ্কর্মা, বেকার, বুড়ো-বুড়ি আত্মীয়স্বজনও বড় কম নয়। বাইরের দিকে ব্যারাকবাড়ির মতো লম্বা দালানে তারা থাকে। ফলে, তাদের বাড়িটায় তেমন নিস্তব্ধতা নেই। সর্বদাই সরগরম।

এঃ মাঃ! বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শান্তি।

কী হল রে?

যাঃ, দাদার ঘুড়িটা কেটে গেল!

কোনটা?

ওই যে চাঁদিয়াল! দেখছিস না কেমন ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ওই রাক্ষুসে কালো ঘুড়িটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলছিল। ওই যে ভোমা ঘুড়িটা, দেখেছিস।

ঘুড়ির প্যাঁচ দেখতে নীপার ভীষণ ভাল লাগে! এক সময়ে নিজেও ওড়াত। মা বন্ধ করে দিয়েছে, ওসব নাকি মেয়েদের ব্যাপার নয়। আজকাল ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা ব্যাপার আছে নাকি! কিন্তু সে কথা মাকে কে বোঝাবে বাবা!

শান্তি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, এখন কী হবে বল তো!

কী আবার হবে। ঘুড়ির প্যাঁচে ঘুড়ি তো কাটেই। বোকার মতো করছিস কেন? এতে মন খারাপের কী আছে?

কিন্তু শান্তি ওরকমই। একটু বোকা আর ভালমানুষ গোছের। আর সেই জন্যই শান্তির সঙ্গে নীপার খুব ভাব। বোকাসোকা লোকদের নীপা পছন্দই করে। কারণ তারা কথা শোনে এবং খুব একটা অবাধ্যতা করে না আর মাঝে মাঝে বেশ তোষামোদও করে। যেমন এই শান্তি।

শান্তির চোখ ছলছল করছিল। বলল, দাদা হেরে গেলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়, জানিস! গতবার স্পোর্টসে দাদা অল্পের জন্য দৌড়ে হেরে গিয়েছিল, আর আমার সে কী কান্না। ইচ্ছে হয়েছিল ফটিকের ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দিই।

ফটিকটা কে?

BanglaBook.org

পাঠকপাড়ার ঢ্যাঙা ফটিক, সব দৌড়েই ওর ফার্স্ট হওয়ার কী বল তো!

ফটিক বুঝি ভাল দৌড়য়?

দৌড়বে না! যা জিরাফের মতো লম্বা লম্বা পা! ওই লম্বা পায়ের জন্যই ফার্স্ট হয়, নইলে দাদার সঙ্গে পারত নাকি?

শান্তির হিরো হচ্ছে ওর দাদা মুন্না। নীপার সব বন্ধুদেরই একজন করে হিরো আছে। কারও বাবা, কারও দাদা, কারও বা অন্য কেউ। শুধু নীপারই কোনও হিরো নেই।

মুন্নাদা কিন্তু আমাকে একবার লাভ লেটার দিয়েছিল।

জানি। আমিই তো চিঠিটা তোদের লেটার বক্সে ফেলে যাই। চিঠিটা ভাল লিখেছিল না? সবাই বলে দাদার বাংলা জ্ঞান নাকি সাংঘাতিক।

মোট পাঁচটা বানান ভুল ছিল তাতে।

আমার দাদার সঙ্গে প্রেম করবি নীপা? খুব ভাল হয় তাহলে। দাদা কত হ্যান্ডসাম বল।

মুন্নাদা তো কালো।

রংটা একটু চাপা, কিন্তু মুখচোখের কাটিং কী ভাল বল! দাদা ইচ্ছে করলে নায়ক-টায়ক হতে পারে।

হাসি পেলেও নীপা হাসল না। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, মুন্নাদা হায়ার সেকেন্ডারিতে কত পেয়েছিল বল তো!

ফিফটি টু পারসেন্ট। ইচ্ছে করলে স্টার পেতে পারত। মতিলাল স্যার তো বলেন, দাদার ব্রেন নাকি ভীষণ ভাল। পড়াশুনোয় মন দেয় না বলে নম্বর ওঠে না। ছবি আঁকে, গান গায়, সোশ্যাল ওয়ার্ক করে। দাদা তো আর কেরানি হওয়ার জন্য জন্মায়নি!

তাহলে কী হবে?

একটা কিছু হবে দেখিস। ওর খুব প্রতিভা আছে। আচ্ছা ওই কালো ঘুড়িটা কে ওড়াচ্ছে বল তো!

কেন?

আরও তিনটে ঘুড়ি কেটে দিল! কী রাক্ষুসে ঘুড়ি রে বাবা!

BanglaBook.org

কে জানে কে!

দেখ দেখ! রায়বাড়ির লোকটা!

কী দেখব?

রায়বাড়ির লোকটাই কালো ঘুড়িটা ওড়াচ্ছে। কী পাজি লোক বল তো!

কান্নি মেরে অনেকটা ওপরে উঠে গেল কালো ঘুড়িটা, তারপর অতি চতুর হাতের খেলায় লাট খেয়ে খেয়ে অমোঘভাবে নেমে আসছিল একটি সাদা ঘুড়ির ওপর, যমদূতের মতো। সাদা ঘুড়িটা বেড়ে যাচ্ছিল। লড়বে, কিন্তু কালো ঘুড়ি খড়্গের মতো লহমায় নেমে এল তার ওপর। কয়েকটা দম বন্ধ করা মুহূর্ত। তারপরই নিপুণ সুতোর টানে কালো ঘুড়ি উঠে গেল ওপরে। সাদা ঘুড়িটা অসহায়ভাবে ভাসতে ভাসতে চড়কডাঙার মাঠের দিকে হাওয়ার টানে ভেসে যেতে লাগল। ঘুড়ি-ধরা ছেলেদের সোল্লাস চিৎকার আর দৌড়পায়ের আওয়াজ এল দূর থেকে। ঘুড়ি ধরতে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে তারা।

নীপা আকাশের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল। কালো যমদূতের মতো চেহারা বটে ঘুড়িটার, কিন্তু কোনও এক ওস্তাদ তাকে ওড়াচ্ছে। এই অবধি সাত-আটখানা ঘুড়ি কেটেছে। সুতোর মাঞ্জা খসে গেছে খানিক, তবু লড়িয়ে ঘুড়ি। অন্য সব উড়ন্ত ঘুড়ি একটু একটু সরে যাচ্ছে কাছ থেকে। ভয় পাচ্ছে নাকি?

নাদব্রহ্ম দুপুরের দিকে গামছা পরে গাড়ু হাতে মুখে গুড়াকু নিয়ে মাঠপানে যাচ্ছিলেন। আজকাল মাঠেঘাটে বড়বাইরে করতে যাওয়া বিপজ্জনক। কারণ এই সম্পন্ন গাঁয়ে লোকবসতি বাড়ছে, ফাঁকা জায়গায় হুটহাট বাড়িঘর উঠছে। বেশ একটা শহর শহর ভাব। বাড়িতে পাকা বাথরুম এবং ব্যবস্থাদি থাকা সত্ত্বেও নাদব্রহ্ম কিছুতেই মাঠে যাওয়া ছাড়বেন না। বললেই বলেন, ও বাবাঃ আমার দম আটকে আসে যে!

BanglaBook.org

করমচাতলায় নাদব্রহ্মকে পাকড়াও করল নীপা, চোখ পাকিয়ে বলল, ব্রহ্মদাদু, ফের মাঠে যাচ্ছ?

নাদব্রহ্ম তটস্থ হয়ে বলেন, না দিদিভাই, এ সময়টায় চারদিক ভারী শুনশান। একেবারে পুকুরে দুটো ডুব দিয়েও আসবখন। বহু কালের অব্যেস কি না।

অব্যেস পালটাও। নইলে কিন্তু খুব প্রেস্টিজের ব্যাপার হবে।

আচ্ছা, না হয় কাল থেকে—

না, আজ থেকেই। এতগুলো টয়লেট রয়েছে কী করতে?

নাদব্রহ্ম কাঁচুমচু হয়ে বলেন, আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।

হ্যাঁ গো ব্রহ্মদাদু, রায়বাড়িতে কে এল বলো তো!

নাদব্রহ্ম গাঁয়ের গেজেট। ঘুরে ঘুরে সব খবর নিয়ে আসেন। এমনকী চন্দ্রমণি যে লোহারদের হুলোটার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে বেড়ায় সে খবরও নাদব্রহ্মই দিয়েছিলেন। একগাল হেসে বলেন, ও তো মৃদুল। কাল বিকেলে গিয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা মেরে এলাম। বেচারার বড় দুর্ভোগ যাচ্ছে। মেম-বউ সব নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে। বড় দুরবস্থা।

আজ মৃদুলদাই ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল বুঝি?

তা ওড়াবে না! ও ছিল মাঞ্জা মাস্টার। গিয়ে দেখি স্পেশাল আঠা জ্বাল দেওয়া হচ্ছে, কাচের গুঁড়োর সঙ্গে আরও কীসব মেশানো হচ্ছে। এমনই কারবার।

শুনলুম বাড়ি বিক্রি করতে এসেছে!

তাই তো কথা। কিন্তু ফ্যাকরা আছে।

তাই বুঝি?

বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বড়ই জটিল দিদিভাই, কোথা দিয়ে যে পট করে ভাগীদার বেরিয়ে আসে তার ঠিক কী? এতকাল তো শুনে এসেছি, মৃদুল ছাড়া আর রায় বংশের কেউ নেই। কিন্তু এখন দু'জনের কথা শোনা যাচ্ছে। তবে তাদের না দিলেও চলে।

বিষয়-সম্পত্তির প্রসঙ্গে নীপার বিশেষ আগ্রহ নেই। জ্ঞান হয়ে ইস্তক

BanglaBook.org

নিজের বাবাকে তো দেখছে। দিল্লির পাস-করা কৃষি বিশেষজ্ঞ। কিছুদিন কলেজেও পড়িয়েছে। তারপর ব্যবসা-ব্যবসা করে লোকটা একদম হাওয়ার নাড়ু হয়ে গেল। এই কানাডা যাচ্ছে তো এই ভিয়েতনাম, এই আমেরিকা তো এই চিন। যেটুকু সময় গাঁয়ে থাকে তার সবটাই চলে যায় কোল্ড স্টোরেজে। তার যে একটা বাবা আছে সেটা টেরই পায় না নীপা। নামই দিয়েছে অ্যাবসেন্টি ড্যাড। এত রোজগারের যে কী দরকার তাও বোঝে না নীপা। শুধু রোজগারই যদি করবে তবে জীবনযাপন করবে কখন?

মৃদুলদা বেশ ঘুড়ি ওড়ায়, না ব্রহ্মদাদু? আজ সকালে অনেকগুলো ঘুড়ি কেটেছে।

অনেক গুণ দিদিভাই, অনেক গুণ। কাল রাতে আড়বাঁশিতে শংকরা বাজাল, বুঝলে! কতকাল প্র্যাকটিস নেই তবু নিখুঁত।

আজ সারা বাড়ি পাকা তালের গন্ধে ম' ম' করছে। উঠোনে চারজন কাজের মেয়ে বেতের ঝাঁঝরিতে তাল ঘষে তলার গামলায় ফেলছে। এ বাড়িতে সব কিছুই হয় বেশ পাইকারি হারে। এ বাড়িতে থাকা মানে অনেকটা কমিউনে থাকার মতো। সারাক্ষণ সরগরম।

নীপবীথির খুব যে খারাপ লাগে তা নয়। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাল নিয়ে কাণ্ডটা দেখল। একটা অল্পবয়সি মেয়ের বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে একটা গ্যাদরা বাচ্চা, শাড়ির তলায়। বোধহয় মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে। লজ্জা পেয়ে পালিয়ে এল নীপা।

ঠাকুমাকে কেন সে সুধামা ডাকে তার কোনও কারণ নেই। তার দাদা বীতশোক ডাকা শুরু করেছিল। সে এখন দিল্লিতে ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। দাদার দেখাদেখি বড়দি ছায়াবীথিও ডাকত। ছায়াবীথির বিয়ে হয়ে গেছে দু' বছর হল। ছোড়দি বনবীথি সুধামাকে কিছুই ডাকেনি কোনওদিন। কারণ সে বোবা এবং কালা। কলকাতার বেলামাসি তাকে এক রকম পুষ্যি নিয়ে রেখেছে নিজের কাছে। মেসোর বিরাট বাড়ি, অনেক টাকা এবং সন্তান নেই। বনবীথিই নাকি সব পাবে। আর সেই জন্যই তার অনেক বিয়ের সম্বন্ধ আসে।

BanglaBook.org

সুধামার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লেই আর কিছু বলতে হয় না। সুধামার নরম তুলতুলে হাত ভারী আরামের বিলি কেটে যায় মাথায়।

আচ্ছা সুধামা, রায়বাড়িতে নাকি ভূত আছে!

ভূত! কী জানি বাপু, শুনিনি তো কখনও।

আছে কিন্তু। অনেকেই দেখেছে।

দুর পাগল! তোর কেবল ভূতের ভাবনা। আমি মলে ভয় পাবি তো!

ফের মরার কথা! বলো না রায়বাড়িতে ভূত আছে কি না।

থাকলে কি আর গোবিন্দ রায় দেখত না! অত বড় বাড়ি আগলে কতদিন একলাটি ছিল।

আচ্ছা, তোমার সঙ্গে নাকি গোবিন্দদাদুরই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল!

দুর মুখপুড়ি! বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কে বলল? বয়সকালে মেয়েদের বিয়ের কত সম্বন্ধ আসে। গোবিন্দ রায়ের সঙ্গেও সেরকম কথা হয়েছিল।

গোবিন্দদাদুকে বিয়ে করলেই পারতে কিন্তু সুধামা। কেমন হ্যান্ডসাম ছিল বলো। টান লম্বা চেহারা, বুড়ো বয়সেও শরীরে ফ্যাট ছিল না।

তা ওরা সুন্দরেরই বংশ। তাই বলে কি আর তোর দাদু কম ছিল নাকি?

দাদুর চেহারা খারাপ ছিল না। বেশ তাগড়াই কুস্তিগিরের মতো। কিন্তু গোবিন্দদাদুর চেহারা ছিল রাজপুত্তুরের মতো। দাদু বড়জোর কোটালপুত্তুর।

সুন্দর পুরুষ হলেই ঢলে পড়তে হবে বুঝি? আমাদের সে রেওয়াজ ছিল না। তোদের মতো নাকি?

আমরা কি খারাপ?

খুব খারাপ। হায়া লজ্জা নেই। এই যে সেমিজ পরে সারা বাড়ি ঘুরছিস, আমরা পারতুম এরকম?

তুমি একটি বুড়ির পুঁটুলি। কতদিন না শিখিয়েছি এটা সেমিজ নয়, নাইটি।

ওই হল। নাম পালটালে কি আর জিনিস জাতে ওঠে?

BanglaBook.org

ওটাই তো তোমার সঙ্গে আমার জেনারেশন গ্যাপ। জেনারেশন গ্যাপের মানে শিখিয়েছিলাম মনে আছে?

খুব আছে।

এবার গোবিন্দদাদুর কথা বলো তো! তোমার বিরহেই নাকি গোবিন্দ রায় আর বিয়েই করলেন না!

তোর মাথা। গোবিন্দ রায়ের বিয়ের ইচ্ছেই ছিল না।

কী করে বুঝলে?

কত মেয়ে দেখা হল, গোবিন্দ রায় মাথাই পাতল না।

সেটাই তো বলছি। মাথা পাতবে কী করে? তুমি যে তার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছিলে।

তোর মাথা। আমি চিবোতে যাব কোন দুঃখে? ভাল করে কি তাকিয়েছি কোনওদিন? আমাদের বাপু চোখ থাকত মাটির দিকে।

তলে তলে ঠিক দেখতে। হ্যাঁ সুধামা, বিয়ের পর গোবিন্দ রায় তোমার সঙ্গে লাইন দেওয়ার চেষ্টা করেনি?

মুখের আগল নেই তোর! লাইন দিলেই হল! আমরা থাকতুম অন্দরমহলে।

দাদুর বন্ধু ছিল তো! মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসত!

তা আসবে না কেন? বৈঠকখানায় বসে গল্পসল্প করত।

তুমি চা দিতে যেতে না কাছে?

এক-আধবার যেতে হয়েছে। কিন্তু সে আমল ছিল অন্য রকম।

কীরকম?

সে তুই বুঝবি না, তখন আমাদের কাছে পরপুরুষ মানে সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল।

বুকে হাত দিয়ে বলো তো, গোবিন্দদাদুকে দেখে তোমার বুকটুক কাঁপেনি কখনও?

শোন মুখপুড়ি, সব মেয়েমানুষেরই এক কথা। তারা একটি নিয়েই থাকতে ভালবাসে। পুরুষমানুষদের ছোঁক ছোঁক বাই আছে, মেয়েমানুষদের ওসব নেই। ভাল হোক মন্দ হোক নিজের মানুষটাকে

BanglaBook.org

ঘিরেই সে থাকতে চায়। দুটো-চারটে অন্য রকম ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু সেটাকে হিসেবের মধ্যে না ধরলেও চলে। গোবিন্দ রায়কে দেখে আমার তো বাপু কেঁপে-ঝেঁপে মরার অবস্থা কখনও হয়নি।

মেয়েদের তুমি কিছু জানো না। রামায়ণ মহাভারতে পরকীয়া কম আছে নাকি? সতীপনার ধারেকাছেও তো ছিল না তারা। রোজ গীতা পড়লেই হবে? পঞ্চকন্যাস্মরেন্নিত্যং বলো, তা পঞ্চকন্যার কার চরিত্র ভাল ছিল বলো তো!

ঠাকুরদেবতাদের কথা আলাদা।

মোটেই ঠাকুরদেবতা নয়। আমাদের মতোই মানুষ। আর ঠাকুরদেবতা হলেই বুঝি যা খুশি করা যায়? বেশ কথা তো! তাই যদি হবে তাহলে ঠাকুরদেবতা বলে মানতে যাব কেন?

ভারী দজ্জাল হয়েছিস। তা হ্যাঁ রে, তোর কাছে তো আমার কোনও কথা বলতে আটকায় না। বলি কী, পুরুষদের শরীরের খিদে বেশি বলেই না তারা খারাপ পাড়ায় নষ্ট মেয়েমানুষদের কাছে যায়। মেয়েদের জন্য তো সেরকম ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের সংযম আছে বলেই ব্যবস্থাটার দরকার হয়নি। ঠিক কি না বল।

ওমা! বেশ আর্গুমেন্ট করতে শিখেছ তো! মেয়েমানুষদের জন্য ওরকম ব্যবস্থা পুরুষরাই করতে দেয়নি। তাহলে যে ঘরের বউ ঝি-রা বেহাত হয়ে যাবে! পুরুষরা কি কম পাজি?

আমিও তো সেই কথাই বলছি। মেয়েরা পুরুষদের মতো পাজি নয়, অসংযমী নয়। হলে কি আমিও ফস্টিনস্টি করার সুযোগ পাইনি? ওসব মনেই হত না কখনও।

যাই বলো, গোবিন্দদাদুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে কিন্তু বেশ হত।

তোকে আজ গোবিন্দ রায় পেয়ে বসেছে। ওরে, সে অন্য ধাঁচের ছিল। অনুশীলন সমিতি না কি ছাঁইপাশ খুলে লাঠিখেলা ছোরাখেলা করত, ব্রতচারী করত, ব্রহ্মচর্য করত, আড়বাঁশি বাজাত, বিয়ে বসে সংসারধর্ম পালন করার সময়ই ছিল না তার।

ও বাবা! খুব যে দরদ দেখছি! তা গোবিন্দদাদু যদি ব্রহ্মচারীই হবে

BanglaBook.org

তাহলে বুড়ো বয়সে এ বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করত কেন? এসে কত হাসিঠাট্টা, গল্পগাছা, দু'জনেরই চোখমুখ ঝলমল করত, বয়স কমে যেত পঞ্চাশ বছর।

আর জ্বালাসনি দিদি। গাঁ-গঞ্জে ওরকম যাতায়াত তো হয়ই। গাঁয়ের লোকেদের আর কাজ কী, সময় কাটানো ছাড়া!

সে যাই বলো, তোমাদের কিন্তু তলে তলে একটু ছিলই। আমরা বলি বাইপাস।

ছিল তো ছিল।

এই তো চাই। এতক্ষণ কবুল করছিলে না কেন?

তুই বড্ড পাজি হয়েছিস। ট্যাঁশদের স্কুলে পড়েছিস তো, হওয়ারই কথা।

ইংলিশ মিডিয়ম মানেই ট্যাঁশদের স্কুল নয়। আজকাল এ দেশে ট্যাঁশ খুঁজেই পাওয়া যায় না। রায়বাড়িতে লোক এসেছে জানো?

তাই বুঝি! মৃদুল এল নাকি?

চার

সেবার চেঁচানি শুনে বই ফেলে দরদালানে বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে ঝুঁকে মৃদুল জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

সেবার হাতে একটা শলার ঝাঁটা। রাগের গলায় বলে, দ্যাখো না কাণ্ড! কত বড় কইমাছটা মুখে করে নিয়ে পালাল!

কে পালাল?

আবার কে, ওই তো নীপাদের বেড়াল। আড়ায় আড়ায় ঘুরছিল, তখনই বুঝেছিলাম, মতলব খারাপ। সবে মাছ কাটব বলে ছাইয়ের মালাটা আনতে গেছি, চোখের পলকে মাছ নিয়ে পালাল।

মৃদুল হাসল। তার রাগ হল না। চোরকে বেশ দিব্যি দেখতেও পাচ্ছিল। রান্নাঘরের টিনের চালে বসে অতিশয় যত্নে মাছটি খাচ্ছে। চোর হলেও

BanglaBook.org

ভারী সুন্দর চোর। ধবধবে সাদা রঙের ওপর হালকা বাদামি ছোপ। ভাবভঙ্গিতে আদুরে ভাবটা ভারী মাখো মাখো হয়ে আছে। বেড়াল তার পছন্দের জীব নয় বটে, কিন্তু আজ সকালে বেড়ালটাকে দেখে তার বেশ লাগল। বেড়াল চোর তাড়ায় না, বেড়াল অলস, বেড়াল নিজেই চোর, বেড়াল বিশ্বাসঘাতক। বেড়ালের ইঁদুর মারার যে মিথ আছে সেটাও সর্বাংশে সত্যি নয়। বেড়াল বেশির ভাগ সময়েই ইঁদুর দেখলেও তাড়া করার পরিশ্রম করতে চায় না। এই অকর্মণ্য জীবটাকে পোষার কোনও মানেই হয় না।

সেবা গজগজ করছিল। সবচেয়ে বড় মাছটাই নিয়ে গেছে। আসুক আবার, ঝ্যাঁটাপেটা করে তাড়াব। কোথায় গেল বলো তো, ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছ?

মৃদুল স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। চালের পশ্চিম দিককার ঢালে খাপ পেতে বসে গিন্নিবান্নিদের ভঙ্গিতে মাছ খাচ্ছে। ঢালের জন্য সেবা দেখতে পাচ্ছে না। মৃদুল বলল, যেতে দাও। বেড়ালে চিরকালই মাছ চুরি করে।

তুমি জান না, ও হচ্ছে বড়লোকের আদুরে বেড়াল। দু'বেলা দুধে-মাছে গান্ডেপিন্ডে গিলছে। তাও সাত হাত নোলা বাবা। বিলোচন আবার আদর করে নাম রেখেছে চন্দ্রমণি দত্ত। চন্দ্রমণি না চোরচূড়ামণি। লক্ষ্মীদি এসে আমাকেই বকবে'খন।

দত্ত! বেড়ালের আবার পদবিও হয় নাকি?

কলিকালে কী না হয়। বিলোচনের কুকুরের নাম বিমোহন দত্ত। আরও কত দেখবে, থাকই না।

থাকছে, আপাতত থাকছে মৃদুল। তিনটে দিন দিব্যি কেটে গেল। কিছুমাত্র খারাপ লাগল না তো! কাল রাতে একটা ঝটকা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। প্রথমে মার মার করে তেড়ে এল বাতাস। জানালা-দরজার সে কী দাপাদাপি! তারপর হাঁকার পাড়তে পাড়তে মেঘ, ক্ষুরধার বিদ্যুৎ। তারপর বৃষ্টির নুপুর।

বুদ্ধি করে তার বিছানায় কে একটা কাঁথা রেখে গেছে। লক্ষ্মীদিই হবে

BanglaBook.org

হয়তো। ভাগ্যিস রেখেছে। মধ্যরাতে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অমন ঠান্ডা পড়ে যাবে কে জানত! কাঁথার ওমের মধ্যে শুয়ে সে বাইরে মুহুর্মুহু বজ্রপাতের শব্দে চমকে উঠছিল। ছাদ ফুটো করে এক-আধটা আবার নেমে আসবে না তো!

আজ সকালে আর মেঘ নেই। ভেজা আকাশে ঠান্ডা সূর্য উঠেছে। শরৎকাল যে কী এক মোহময় ঋতু তা চোখ মেলেই অনুভব করেছিল সে। কাল বিকেলে পাড়ার দুটো পনেরো-ষোলো বছর বয়সি ছেলে এসেছিল। গোপাল আর কিশোর। ঘুড়ি ওড়ানো বিষয়ে তাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিতে হয়েছিল। শেষে বলল, স্পোর্টস হিসেবে ঘুড়ি ওড়ানোর কোনও দাম নেই। এ হল পাসটাইম। ঘুড়ি ওড়ানোর চেয়ে ফুটবল ক্রিকেট অনেক ভাল। কাল সকালে মনসাতলা বারোয়ারি পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল কয়েকজন যুবক। একশো টাকা চাঁদা পেয়ে তারা যেমন অবাক, তেমনি খুশি।

তবু গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা ঝালাই করে আর লাভ নেই। সম্পত্তি বেচে দিলে আর সম্পর্ক কীসের! আর কোনওদিন এ মুখো হওয়ার দরকার হবে না। আর এই চিন্তাটাই বার বার তাকে অন্যমনস্ক করছে। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে পুরনো আলমারি ঘেঁটে কবেকার ট্রেজার আইল্যান্ড বইটা পেয়ে সকাল থেকে পড়ছিল সে। কিন্তু মন বসছে না। বার বার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে রোদে, হাওয়ায়।

বইটা বন্ধ করে সে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময়ে লক্ষ্মীদি এল, সঙ্গে লম্বামতো কেঠো চেহারার একজন লোক। তার পরনে ধুতি আর সাদা শার্ট।

একে চেনো?

মৃদুল চেয়ে ছিল। তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকেই সে বলে উঠল, দীনুদা না?

অবাক দীননাথ বলল, চিনতে পারলে? কবেকার কথা!

হেসে মাথা নেড়ে মৃদুল বলে, বেশি কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সাঁতার। খবরের কাগজে তোমার নাম উঠেছিল।

BanglaBook.org

আর, একবার মনে আছে তুমি জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে বসে কাঁদছ আর জ্যাঠামশাই তোমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

দীননাথ স্মিত হেসে বলে, ঠিকই মনে আছে। আমার মায়ের সৎকার করার টাকা ছিল না। সেই টাকা জ্যাঠামশাই কখনও শোধ নেননি।

বোসো দীনুদা।

দীনু বসে বলল, দেশের পাট চুকিয়ে দিতে এসেছ শুনলাম।

একরকম তাই।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিষয়-সম্পত্তি বড় কম নেই। বার্ষিক আয়ও আছে। হরজ্যাঠা সব আগলে রেখেছিল বলে রক্ষে।

শুনেছি।

তোমার জ্যাঠা গোবিন্দ রায়ের নামেই সব। উনি ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে যাননি। উইল-টুইলও নেই। অনেকবার বলেছি, গোবিন্দজ্যাঠা, একটা বিলিব্যবস্থা করুন, নইলে আপনি চোখ বুজলে সব লুটপাট হয়ে যাবে। উনি শেষ দিকটায় ভারী মনমরা থাকতেন। বলতেন, উড়ে-পুড়েই যাক। বংশটাই লোপাট হয়ে গেল!

মৃদুল সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, উইল না থাকায় কি বিক্রি করতে অসুবিধে হবে?

দীননাথ মাথা নেড়ে বলল, না। সেটা সামলানোর দায় আমার। কিন্তু আরও একটা ব্যাপার আছে। শুনেছ বোধহয় এই সম্পত্তির তুমি ছাড়াও তিনজন অংশীদার আছে।

শুনেছি।

তাদের মধ্যে একজন তোমার মেম-বউদি। অংশীদার হলেও তিনি বোধহয় সেটা জানেনও না। আর আছেন নগেন রায়ের স্ত্রী কালীশশী। নিঃসন্তান এবং সোজা সরল মানুষ। বয়সও হয়েছে। তিনিও অংশীদার। তবে দাবিদার নন। আরও একজন হল পুতুলপিসির ছেলে নিতু। পুতুলপিসি যখন মারা যান তখন নিতুর বয়স এক বছর। এ বাড়ি বা বিষয়-সম্পত্তির বিষয়ে সে কিছুই জানে না, কখনও আসেনি বা কাউকে চেনেও না। কিন্তু সেও ন্যায্য অংশীদার বটে। যদি আইনের পথে

BanglaBook.org

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করতে চাও তাহলে এই তিনজনের কনসেন্ট দরকার হবে। এবং এরা চাইলে ভাগও দিতে হবে।

মৃদুল কথাগুলো তেমন মন দিয়ে শুনছিল না। একটু মেদুর মুখে বসে কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, নিতুকে আমার মনে নেই।

মনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সে কখনও এ বাড়িতে আসেইনি।

মৃদুল তেমনই আনমনা মুখে বলে উঠল, কিন্তু আবছা হলেও কালীশশী খুড়িমাকে আমার মনে আছে। খুব নিরীহ, খুব চুপচাপ, সব সময়ে কেবল কাজ করত। আমরা বাচ্চারা সবাই খুড়িমার খুব ন্যাওটা ছিলাম। যখনই খিদে পেত খুড়িমার কাছে গিয়ে বায়না করতাম। বড় ভালমানুষ।

তোমার তো অনেক কিছু মনে আছে!

মৃদুল স্বপ্নোত্থিতের মতো সুদূরলগ্ন চোখে চেয়ে আত্মগতভাবে বলল, এত লোক ছিল। সব কোথায় গেল বলো তো!

দীননাথ একটু হাসল মাত্র। লক্ষ্মী বলল, এ বাড়িতে সব আছে, শুধু লোক নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুল বলল, সব ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই তিন-চার দিন থাকতে থাকতে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা বা এক একজনকে মনে পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, নগেনকাকার একটা সবুজ রঙের সাইকেল ছিল না?

লক্ষ্মী বলল, ছিল। শৌখিন মানুষ ছিলেন। তার জুতো, জামা, ঘড়ি সবই ছিল আলাদা রকমের।

একটা কথা বলব লক্ষ্মীদি?

কী কথা?

কালীশশী খুড়ির কি কোথাও কলঙ্ক রটেছিল?

কে বলল তোমাকে?

কেউ বলেনি তো! মনে পড়ল, ছেলেবেলায় মা আর বাবাকে এ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি।

লক্ষ্মী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ।

BanglaBook.org

তার পরের ঘটনা মনে নেই।

নগেন রায় কালীশশীকে তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে রেললাইনে গলা দিয়েছিলেন। শুনেছি বউকে খুব ভালবাসতেন।

খুড়িমা কেমন আছেন?

দীননাথ বলল, বেঁচে আছেন মাত্র।

আমার কী করা উচিত দীনুদা?

সেটা তুমিই ভেবে ঠিক করো। কথাগুলো তোমাকে জানানো দরকার ছিল বলে জানালাম। লক্ষ্মীর মত হল, ওরা তিনজন অংশীদার হলেও এ বাড়ির সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ছিল না বা নেই। ওদের আগ বাড়িয়ে ভাগের অংশ দেওয়ার মানেই হয় না।

মৃদুল মাথা নেড়ে বলে, আমার তা মনে হয় না। বউদির সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারব, কিন্তু অন্য দু'জনের সঙ্গে...

লক্ষ্মী ধমকের গলায় বলল, ওসব এখনই করতে যেয়ো না। ভালমানুষি অনেক সময়েই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব দিক আগে ভাল করে বিচারবিবেচনা করতে হবে। তোমার বউদি আবার বিয়ে করেছে কি না তা কি খবর নিয়ে দেখেছ?

না। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। দাদার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে গিয়েছিলাম, তখন দেখা হয়েছিল। তার পর থেকে আর...

সেসব খবর নাও। না জেনে হঠাৎ বউদিকে সম্পত্তির ভাগ অফার করতে যাবে কেন? তা ছাড়া তোমার তো একটা মেয়ে আছে। সেও কি অংশীদার নয়?

মৃদুল হেসে ফেলল।

দীননাথ বলল, হ্যাঁ, আইনত সেও পায়। তবে সে পায় তার বাপের অংশ।

মৃদুল মাথা নেড়ে বলল, ভাগজোখের কথা না হয় পরে ভেবে দেখব। এখন ওসব নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

দীননাথ মৃদু হেসে বলল, এতদিন পর দেশে ফিরে তোমার কেমন লাগছে?

BanglaBook.org

আশ্চর্যের বিষয়। খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ভেবেছিলাম এখানে এসে খুব একঘেয়ে লাগবে। নাথিং মুভস হিয়ার। সব কিছু যেন থেমে আছে। তবু বিস্ময়ের কথা আমার কিছু খারাপ লাগছে না। আই অ্যাম এনজয়িং ইট।

কোনও খরিদ্দার যোগাযোগ করেছে কি?

এখনও নয়। তবে গয়ানাথ বলেছে, হয়ে যাবে।

দীননাথ মাথা নাড়া দিয়ে বলল, অত সহজ নয়। এত বড় ছড়ানো সম্পত্তি এক লপ্তে কেনার লোক নেই। চাষের জমি, মাছের পুকুর, আম-নারকোলের বাগান আর বাড়ি আলাদা আলাদা বিক্রি করতে হবে। কোনও দলিলে যদি দুটি জিনিস এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে তবে অ্যাপোরশনমেন্ট করার ঝামেলা আছে।

মৃদুল তেমন গা করে শুনছিল না এসব। একটা কেমন ঘোর-লাগা চোখে চেয়েছিল। শুধু মৃদু একটা 'হুঁ' দিল।

লক্ষ্মী বলল, তুমি এখন যাও দীনুদা। বিষয়-সম্পত্তির কথা ওর মাথায় ঢুকবে না। সবাই তো আর তোমার আর আমার বাবার মতো দিনরাত বিষয়-সম্পত্তি, ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে মজে থাকে না।

দীনু একটু হেসে উঠে পড়ল, যাই রে মৃদুল।

আবার এসো দীনুদা।

আসব।

দীননাথ চলে গেলে লক্ষ্মী বলল, আইন-কানুনে কী আছে তা আমি জানি না বাপু, কিন্তু এ বাড়ির সঙ্গে যাদের সম্পর্কই হল না তাদের ডেকে ডেকে এনে ভাগ দেওয়ার কোনও দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। দীনুদার সব ব্যাপারেই বড় বাড়াবাড়ি। কী দরকার ছিল খুঁজে খুঁজে ভাগীদার বের করার?

মৃদুল লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল, বাড়ির ওপর আপনার খুব মায়া, না?

মায়া তো হওয়ারই কথা। ছেলেবেলা থেকে আসা-যাওয়া। আর জ্যাঠামশাই তো বড্ড ভালবাসতেন। সকালের জলখাবার খেয়েছ তো!

BanglaBook.org

হ্যাঁ। সেবা খুব কর্মঠ মহিলা।

ছাই কর্মঠ। এসেই তো শুনলাম, বেড়ালে মাছ নিয়ে গেছে।

লক্ষ্মীদি নীচে যাওয়ার একটু বাদেই ছেলে দুটি এল। গোপাল আর কিশোর। তাদের চোখে রীতিমতো সমীহের দৃষ্টি। গোপাল বলল, আজ আপনি ঘুড়ি ওড়াবেন না?

একটু ভাবিত হয়ে মৃদুল বলল, ওড়াব?

ন' পাড়ার ছেলেরা আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে।

মৃদুল প্রথমে অবাক হল, তার পর হেসে ফেলে বলল, চ্যালেঞ্জ! কই, কেউ এসে আমাকে কিছু বলেনি তো!

আজ আপনার ঘুড়ি কাটবেই।

বটে! তা তোমরা কোন পক্ষে?

বাঃ, আপনি তো আমাদের পাড়ার লোক। আমরা আপনার দলে।

ঠিক আছে, চল ছাদে যাওয়া যাক।

আপনি কিন্তু কালো ঘুড়িই ওড়াবেন। নইলে কেউ বুঝতে পারবে না।

ঠিক আছে।

ছাদে উঠে দেখা গেল আজ আকাশে ঘুড়ির মেলা। চারদিকে ঝিলমিল করছে ঘুড়ি আর ঘুড়ি। লাল, সাদা, নীল, সবুজ, কমলা, হলুদ, নকশাদার। যেন আকাশে একটা বাগান।

ভেড়ার পালে বাঘ পড়ল একটু পরেই। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সাত-আটখানা ঘুড়ি কেটে এবং শেষ অবধি কাটা পড়ে লাটাইয়ে সুতো টেনে নিয়ে হাসিমুখে মৃদুল লাটাইটা গোপালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এবার তোমরা ওড়াও।

গোপাল আর কিশোর মুগ্ধ বিস্ময়ের চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল। গোপাল বলল, আপনার মতো তো পারব না।

পারবে। ওড়াও। ঘুড়ি ওড়ানো, প্যাঁচ খেলা সোজা কাজ।

দুপুরে খাওয়ার সময় মৃদুল হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল লক্ষ্মীকে, আচ্ছা, জ্যাঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ কে করেছিল?

লক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে বলল, কে আবার করবে। জ্যাঠামশাই নিজের শ্রাদ্ধ

BanglaBook.org

নিজেই আগেভাগে করে রেখেছিলেন। মুখাগ্নি করেছিল গয়ানাথ। কেন বলো তো?

জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর খবর আমি পাই দাদার কাছে। দাদা টেলিফোনে খুব ক্যাজুয়ালি জানিয়েছিল। সেই সময়ে কী একটা যেন খাচ্ছিলাম। বোধহয় হ্যামবার্গার। খবরটা শোনার পরও সেটা খেয়ে শেষ করেছিলাম। খবরটা শুনে আমারও তেমন কোনও রি-অ্যাকশন হয়নি। যেন অন্য কারও মৃত্যুসংবাদ শুনছি, যাতে খুব বেশি কিছু এসে যায় না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন, এখানে আসার পর জ্যাঠামশাইয়ের অনেক কথা ভীষণ মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব ফিল করছি তাকে। ঠিক বোঝাতে পারব না। বাড়িটার মধ্যে যেন জ্যাঠামশাইয়ের একটা স্পন্দন এখনও আছে।

আছেই তো। সেটা আমি খুব টের পাই।

আচ্ছা, এখন যদি আমি জ্যাঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ করতে চাই তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে? শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু?

হঠাৎ শ্রাদ্ধ করতে যাবে কেন?

এমনি। জ্যাঠামশাইয়ের তো কেউ ছিল না। আমরা দু' ভাই অশৌচ-টশৌচও পালন করিনি।

এতদিন পর শ্রাদ্ধ করা যায় কি না তো জানি না। বরং পুরুতমশাইকে জিগ্যেস করে দেখো।

তিনি কে?

ব্রজ ভট্‌চায।

পুরুতরা তো দক্ষিণা পেলে সব কিছুতেই রাজি হয়ে যায়।

লক্ষ্মী হাসল। বলল, তাতে ক্ষতি কী? তোমার কাজ তো হবে।

দাঁড়ান, ভেবে দেখি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

কী বল তো?

দাদারও কিন্তু শ্রাদ্ধ হয়নি।

লক্ষ্মী চুপ করে রইল।

জ্যাঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ করলে দাদারটাও আমার করা উচিত।

BanglaBook.org

এ কথারও লক্ষ্মী কোনও জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, কাল রাতে তুমি বাঁশি বাজাচ্ছিলে?

মৃদুল একটু লাজুক হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ। বহুকাল বাজাইনি। মাড়োয়া।

তুমি ক্লাসিক্যাল জানো?

সামান্য।

বাঁশিটা তোমাদের বাড়ির প্রায় সবাই জানে।

হ্যাঁ। আমি শিখেছিলাম খানিকটা বাবার কাছে, তারপর এক ওস্তাদের কাছে। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে বেশ কয়েকটা বাঁশি দেখে লোভ সামলাতে পারিনি।

খুব ভাল বাজাও তুমি। ব্রহ্মদাদু খুব প্রশংসা করছিলেন।

হ্যাঁ। উনি সমঝদার মানুষ। রোজই রাতের দিকে বাঁশি শুনতে আসেন। আজও আসবেন। অদ্ভুত লোক, না?

অদ্ভুত হবেন কেন?

অদ্ভুত নয়? এমন লোক আমি দেখিনি যার নিজের কিচ্ছু নেই। বউ-বাচ্চার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ি ঘর জমি টাকাপয়সা কিছু নেই। পরের আশ্রয়ে থাকেন।

এরকম অনেক লোক আছে। লোকটা নিষ্কর্মা হলেও গুণের অভাব নেই কিন্তু। বিলোচন দত্তের বাড়িতে ওরকম লোক অনেক ক'টা আছে। ওর বাবার আমল থেকেই আছে।

মৃদুল একটু হেসে বলল, আচ্ছা, আমার অবস্থা তো ওরই মতো। বউ-বাচ্চা নেই, বাড়িঘর মর্টগেজে, চাকরি বলতে ফুরনের কাজ। বিলোচন দত্তের বাড়িতে আমার আশ্রয় জুটবে না?

ভ্রু কুঁচকে লক্ষ্মী বলল, জুটবে না কেন? খুব জুটবে। বিলোচন তো তার ছোট মেয়ের জন্য ঘরজামাই রাখবে ঠিক করে রেখেছে। দরখাস্ত করতে পারো।

দুর! ঘরজামাই-টামাই হলে আর মজা কী? নিষ্কর্মা ভবঘুরের মতো থাকতে পারলে তবে মজা।

BanglaBook.org

এই বয়সেই নিষ্কর্মা হওয়ার এত শখ কেন?

আমার কেমন ধারণা হয়েছে, কাজ মানেই উঞ্ছবৃত্তি। বিদেশে যাওয়ার আগে আমি একটা কলেজে পড়াতাম। সেটাও আমার খুব একটা ভাল লাগত না। আর বিদেশে গিয়েও টাকা রোজগার করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। কখনও রেস্টুরেন্টের ওয়েটার, কখনও গ্যাস স্টেশনের অ্যাটেনড্যান্ট, কখনও হোটেলের রুমকিপার। সবই উঞ্ছবৃত্তি বলে মনে হত।

তবে ওখানে মাটি কামড়ে পড়েছিলে কেন?

কী করব? দাদার চাপাচাপিতে যেতে হল। কিন্তু এতদিন থেকে বুঝেছি, আমি ওখানে মিসফিট। আমি এখানেও মিসফিট।

লক্ষ্মী হেসে ফেলল। তারপর বলল, তা বললে তো চলবে না। পুরুষমানুষকে কাজ ছাড়া মানায় না। তোমাকে আলসেমিতে ধরেছে।

ঠিক তাই।

তুমি নাকি সাংঘাতিক ঘুড়ি ওড়াও। পাড়ার ছেলেরা বলেছে, মৃদুলদা আমেরিকা থেকে স্পেশাল মাঞ্জা নিয়ে এসেছে, নইলে এত ঘুড়ি একা কাটে কী করে?

মাঞ্জাটা স্পেশাল বটে। তবে আমেরিকার নয়। দাদা তৈরি করত। তার কাছেই শেখা।

লক্ষ্মী কিছু বলল না আর। মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে যেতে শুধু বলল, রান্নার ব্যবস্থাটা দেখি গিয়ে। চা খাবে?

না। আমি বেশি চা খাই না।

লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর মৃদুল কিছুক্ষণ ট্রেজার আইল্যান্ডে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। ছাদে পায়ের আওয়াজ আর হঠাৎ হঠাৎ খুশির চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গোপাল আর কিশোর। সে মৃদু একটু হাসল। বোধহয় অনেকদিন পর এ বাড়িটায় একটু প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে।

বিকেলে অনেকটা হাঁটল সে। গোয়ালপাড়া, মনসাতলা, গরানডাঙ্গা গ্রামের সীমানা পার হয়ে খেতখামার অবধি চলে গেল। ধুলোটে গোধূলির মুখোমুখি বসে রইল মাঠে।

BanglaBook.org

গাঁয়ের সবটাই যে সে চিনতে পারছে তা নয়। অনেক কিছু আবছা হলেও মনে আছে। অনেক কিছুই মনে নেই।

ফেরার সময়ে সন্ধে হয়ে আসছিল। অন্ধকারে পথ ভুল হবে ভেবে একটু জোরেই হাঁটছিল সে।

ভুল কিন্তু হল। পুণ্যপুকুর বেড় দিয়ে অনেকগুলো রাস্তা বেরিয়েছে। সেইখানেই ভুল করে একটু নাবালের দিকে চলে গিয়েছিল সে। বাঁশবন আর পর পর মাটির বাড়ির গরিব একটা বসতির পাশ দিয়ে খানিক দূর হেঁটে ভুলটা বুঝে ফিরে এল। 'রায়বাড়ি' জিজ্ঞেস করলে লোকে বলেও দেবে। কিন্তু সেটা চাইছিল না সে। দেখা যাক গাঁয়ের জিওগ্রাফিটা নিজের চেষ্টায় বোঝা যায় কি না।

ফের পুণ্যপুকুরের চারপাশে একটা ঘুরপাক খেয়ে আধপাকা একটা রাস্তা ধরল সে। কিন্তু রাস্তাটা ক্রমশ ঝোপঝাড় আর গাছপালার মধ্যে নিয়ে গেল তাকে। সামনে একটা জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার স্তূপের মতো কিছু পথ আটকে রয়েছে। ঘনায়মান অন্ধকারে ভাল বোঝা যাচ্ছে না এখান দিয়ে পথ আছে কি না। এ পাশটায় বসতি নেই, লোক চলাচল নেই। যাকে বলে ডেড এন্ড।

সামান্য উদ্বিগ্ন মৃদুল ফিরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়াল। স্তূপটা তার খুব অচেনা লাগছে না। সম্ভবত এটা রুকুদের পরিত্যক্ত বাড়ি, এবং সে কোনও না কোনও উপায়ে পথ ভুল করে বাড়িটার পিছন দিকে চলে এসেছে! সে অন্ধকার বাড়িটার দিকে ফের ঘুরে দাঁড়াল। কিছু দেখার নেই। অন্ধকার আর জঙ্গল আর জোনাকির আলো আর ঝিঁঝির করতাল। তবু দাঁড়াল। তার স্মৃতির কোঠায় রুকুর কোনও মুখশ্রী নেই, শরীর নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু শুনেছে, রুকু খুব রূপসী ছিল। রূপসী নানা রকম হয়। কিশোরী বয়সে কোনও এক ব্যাধিতে রুকু আবডালে চলে গেছে, কখনও ফিরবে না আর। কিন্তু সে মাঝে মাঝে মৃদুলের খোঁজ করত। হয়তো একটা প্রত্যাশা ছিল তার। একটা গেঁয়ো মেয়ের তো তেমন প্রত্যাশা থাকতেই পারে। বিশেষ করে তাদের অভিভাবকরা বাল্যকালেই বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল রুকু আর মৃদুলের। সামনের ওই

BanglaBook.org

স্তূপের মধ্যে একটা অসমাপ্ত গল্প ডুবে রয়েছে। কোনও পরিণতি নেই। তার আগেই সমাপ্ত। পৃথিবী কঠিন জায়গা। দুনিয়ার এই নিষ্ঠুর জীবন মৃদুলের সহ্য হয় না। আজ তার রুকুর জন্য কষ্ট হচ্ছে।

কেমন ছিল মেয়েটা কে জানে! তেমন হলে আজ রুকু তার বউ হত, এটাই হত তার শ্বশুরবাড়ি। কেমন জঙ্গল আর অন্ধকার হয়ে আছে এখন।

মৃদুল আনমনে ফিরে আসছিল, পুণ্যপুকুরের কাছ বরাবর একটা সাইকেল তার কাছ ঘেঁষে থামল।

কোথায় গিয়েছিলেন মৃদুলদা?

অন্ধকারে মুখটা চিনতে পারল না মৃদুল। বলল, এই দিকটায়।

ওদিকটা তো ভাল নয়, সাপখোপ আছে।

পথটা ভুল করেছিলাম।

চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই, আমি অশোক, সেদিন চাঁদা চাইতে আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম।

ও।

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে তাকে বাড়ির ফটক অবধি পৌঁছে দিল ছেলেটা। মৃদুল অন্যমনস্ক ছিল খুব। কেন যে সে পথ ভুলে রুকুদের পোড়ো বাড়িটার সামনে চলে গিয়েছিল!

এ বাড়িতে বেশ কয়েকজন কাজের লোক আছে। কিন্তু তাদের খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। মৃদুল ঘুম থেকে উঠে বাথরুম ঘুরে এসে দেখতে পায় তার বিছানা কেউ টানটান করে পেতে ঝেড়ে বেডকভার দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে। কোন ফাঁকে ঘরে ঝাঁটপাট এবং ন্যাতা বোলানো হয়ে যায়। কে যেন ঠান্ডা জল কাচের জগে ভরে দিয়ে মিলিয়ে যায়। এরা কারা, কে এদের মাইনে দেয়, এদের নাম কী তা জানেই না এখনও মৃদুল। এসবের পিছনে অবশ্যই লক্ষ্মীদির অমোঘ কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীদিকেই তো ভাল করে বুঝে উঠতে পারছে না সে। রোজ দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, অল্পস্বল্প ঠাট্টাইয়ার্কিও হচ্ছে, তবু এক কুজ্ঝটিকা আড়াল করে রেখেছে আসল মানুষটাকে। কে ওঁর গুপ্ত প্রেমিক? কোন

BanglaBook.org

অসম্ভব চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সাহসিকতায় এই গ্রামেও নিজের অবৈধ সন্তানকে জন্মাতে দিয়েছে এবং তার জন্য কোনও মনস্তাপে, আত্মগ্লানিতে ভুগছে না?

একদিন জিগ্যেস করবে মৃদুল। সাহস সঞ্চয় করে একদিন চোখ বুজে জিগ্যেস করে ফেলবে। জবাব পাবে না জানে। হরপ্রসন্নও বোধহয় পাননি।

গয়ানাথ একজন খদ্দের এনেছে। দুটিতে চেয়ার পেতে বসে আছে উঠোনে। পাশে মাটিতে শূন্য চায়ের কাপ।

গয়ানাথ বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

একটু ঘুরে এলাম। অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?

আধ ঘণ্টা থ্রি কোয়ার্টার হবে। এ হচ্ছে কমল বিশ্বাস, জরিবুটির কারবার। এ বাড়ি এর দেখা।

কমল বিশ্বাস লম্বাচওড়া লোক। হ্যারিকেনের আলোয় রংটা কালো বলেই মনে হল। মোটা ভুঁড়ো গোঁফ আছে।

একটা আধঘোমটা টানা বউ এসে আর একটা চেয়ার রেখে গেল নিঃশব্দে। মৃদুল বসে বলল, বলুন কমলবাবু।

কমল বিশ্বাস মৃদু স্বরে বলল, আমার তো বলার কথা নয়। বলবেন আপনি।

মৃদুল হেসে বলে, দরদাম তো! এ গাঁয়ের দরদাম আমার জানা নেই। গয়াদা বলবে।

গয়ানাথ বলল, কথা একটা হয়েছে বটে, তবে সেটা তোমার পছন্দ হলে হয়।

কত?

বাড়ি, বাগান, পুকুর নিয়ে দশ লাখ। চাষের জমি কমল নেবে না। ওটা আলাদা বিক্রি করতে হবে। দশ লাখ তোমার ডলারে দাঁড়াবে একুশ হাজারের একটু বেশি। ভেবে দেখ।

মৃদুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনার তাড়া নেই তো!

কমল বিশ্বাস বলল, না, তাড়া কীসের? আপনি বিচার-বিবেচনা

BanglaBook.org

করে গয়ানাথকে দিয়ে খবরও পাঠাতে পারেন।

তাই হবে।

গোবিন্দবাবুর সঙ্গেও কথা হয়েছিল। উনি দোনামোনা করছিলেন। আপনাদের কথা ভেবেই বোধহয়।

বাড়িটা নিয়ে আপনি কী করবেন?

কারবার বাড়াব। জিনিসপত্র রাখার জন্য জায়গাও দরকার।

মৃদুল মাথা নেড়ে বলল, বিক্রি না করেও উপায় নেই। নইলে হরপ্রসন্নকাকার ওপর বড্ড চাপ পড়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি উনি আর কতকাল আগলাবেন?

কমল বিশ্বাস বলল, তা কেন, ওকালতনামা তো ওঁর কাছেই আছে। গোবিন্দবাবু ওঁকেই সব ক্ষমতা দিয়ে গেছেন। উনিই বিক্রি করতে পারেন।

তাই নাকি?

ওঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে। কিন্তু উনিও আপনাদের মত ছাড়া বিক্রি করতে রাজি হননি। আপনি বরং ভেবে দেখুন।

কমল বিশ্বাসকে নিয়ে গয়ানাথ বিদায় হওয়ার পর লক্ষ্মীদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মৃদুল অবাক হয়ে বলে, আপনি এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলেন নাকি? বেরোননি তো!

ইচ্ছে করেই বেরোইনি। কমল বিশ্বাস লোকটাকে আমার পছন্দ নয়।

কেন? লোকটা কি খারাপ?

খারাপ অনেক রকমের হয়। দুম করে খারাপ বলি কী করে? তবে টাকার গরম আছে।

আমি বুঝতে পারছি না দশ লাখ দামটা কম না বেশি।

আমার কাছে তো কমই মনে হচ্ছে।

কত হলে ভাল হয়?

আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই বাপু। আমি বলব এ বাড়ির দাম যদি দশ কোটিও কেউ দিতে চায় তাহলেও সেটা কমই মনে হবে।

BanglaBook.org

মৃদুল হেসে বলল, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু?

তাই ধরে নাও।

তাহলে বরং আর একটু ভেবে দেখি। আচ্ছা তালের বড়ার গন্ধ পাচ্ছি যেন!

ভাজা হচ্ছে।

তাই তো! এখন তো তালেরই সময়।

পছন্দ করো বুঝি?

দারুণ।

কত আর খাবে! সেবা তালের বড়ার আয়োজন করে বসার পর দত্তবাড়ি থেকেও এককাঁড়ি বড়া আর ক্ষীর দিয়ে গেছে তোমার জন্য।

দত্তবাড়ি?

বিলোচন দত্ত। গাঁয়ের সবচেয়ে পয়সাওলা লোক। তুমি যার ঘরজামাই হতে চাও।

যাঃ, আমি আবার কখন ঘরজামাই হতে চাইলাম!

ওই যে বলছিলে ব্রহ্মদাদুদের দলে নাম লেখাবে!

সাজেশনটা তো আপনার। আপনি আমাকে গুড ফর নাথিং মনে করেন বলেই ঘরজামাই হওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে বলেছিলেন।

ঠিক তাই। নিষ্কর্মাদের জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

সে তো ঠিক কথা। কিন্তু তারা চেনে না জানে না, হঠাৎ তালের বড়া পাঠাতে গেল কেন?

তুমি চেনো না বলে কি তারাও চিনবে না? সুধাপানি তো এখনও বেঁচে আছেন।

সুধাপানি কে? আচ্ছা দাঁড়ান, বলবেন না, সেই গোঁফওয়ালা দত্তদাদুর বাড়ি নাকি?

হ্যাঁ। এই তো মনে পড়েছে।

আমাদের বেজিটা কেবল ওদের বাড়িতে পালিয়ে যেত। আর একটা কথা মনে আছে, দত্তদাদু কাবুলি আঙুরের চাষ করেছিলেন।

BanglaBook.org

লক্ষ্মী হেসে ফেলল, হ্যাঁ, বুড়ো দত্তের অনেক রকম পাগলামি ছিল।

দত্তঠাকুমা দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন।

এখনও আছেন। আশি বছর বয়সেও কী রং! কী সুন্দর মুখ!

মনে পড়েছে। আমাদের মাথায় অনেক লেটেন্ট মেমোরি থাকে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে।

তুমি কি জানো, সুধাপানির সঙ্গে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল! যদি সেটা হত তাহলে সুধাপানি ঠাকুমা হয়ে যেত তোমার জ্যাঠাইমা।

তাই বুঝি?

তবে প্রেম-ট্রেম নয়, শুধু সম্বন্ধই এসেছিল। আবার দত্তবুড়ো তোমার জ্যাঠামশাইয়ের খুব বন্ধুও ছিল, অবশ্য বয়সে দত্তবুড়ো কিছু বড়ই ছিল। সুধাপানির সঙ্গে দত্তবুড়োর বয়সের তফাত ছিল প্রায় কুড়ি বছরের। তবু দু'জনে ভাবের অভাব ছিল না।

গাঁয়ের সম্পর্কগুলো খুব গোলমেলে। তাহলে দত্তঠাকুমার আমাকে মনে আছে! বেশ তো!

আরও থাকো, অনেক কিছু মনে পড়বে। আমাকেও তোমার মনে ছিল না, এখনও বোধহয় মনে পড়েনি!

মাথা নেড়ে মৃদুল বলল, না। মনে পড়ার জন্য কোনও একটা ঘটনা চাই। ঘটনার সূত্রেই মনে পড়ে। আপনাকে বা হরপ্রসন্নকাকাকে নিয়ে কোনও ঘটনা নেই বোধহয়।

মনে যখন নেই তখন কী আর করা যাবে। তবে আমি প্রায় সারা দিন এ বাড়িতে পড়ে থাকতাম।

আমাকে আপনার মনে আছে?

বলেছি তো, একটু-আধটু। তোমারও ঘটনা নেই। একটু চুপচাপ আর ঠান্ডা স্বভাবের ছিলে।

হ্যাঁ। আমার দাদা ছিল হারমাদ। আমি নয়।

তালের বড়া আনছি। বলে প্রসঙ্গটা কেটে দিয়ে লক্ষ্মীদি পালাল।

সেবা একটা পোর্সিলিনের সাদা বাটিতে গরম তালের বড়া এনে তার

BanglaBook.org

হাতে দিয়ে বলল, ওদের আদরের বেড়াল তোমার মাছ চুরি করেছে বলে এই তালের বড়া ঘুষ পাঠিয়েছে। অবশ্য আমি বেড়ালের কীর্তির কথা বলায় খুব লজ্জা পেয়ে শশীমুখী মাছও পাঠাতে চেয়েছিল। আমি বারণ করেছি।

মৃদুল অবাক হয়ে বলল, তুমি মাছ চুরির কথা ওদের বলতে গেছ নাকি? এ মা, ছিঃ ছিঃ, কী মনে করলেন ওরা বলো তো! বেড়ালে মাছ খেয়েছে সেটা তো আর ওদের দোষ নয়। তুমি তো আচ্ছা লোক।

সেবা ঝংকার দিয়ে বলল, আর ভালমানুষি করো না তো। চন্দ্রমণির নামে ওদের বাড়িতে রোজ নালিশ আসে। এমন ছোঁচা জীব দুটো দেখিনি! ওর হল চোখের খিদে। অত বড় কইমাছটা কি খেতে পেরেছে নাকি! রান্নাঘরের পিছনে আধখানা পড়ে ছিল, কাকেরা এসে ঠুকরে শেষ করে।

বেড়ালেরা চিরকালই ওসব করে। তুমি ভারী লজ্জায় ফেলে দিয়েছ আমাকে।

ও মাঃ তোমার আবার লজ্জা কীসের! লজ্জা তো ওদের!

লক্ষ্মীদি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। বলল, তুমি অত লজ্জা পেয়ো না তো। গাঁ-দেশে ওরকম সব হয়। এখানে লুকোছাপা নেই। তালের বড়া কেমন হয়েছে, বললে না?

এতক্ষণ এক-আধটা মুখে ফেলেছিল মৃদুল, কিন্তু পরিস্থিতির জন্য স্বাদ পাচ্ছিল না। এবার খেয়াল করে বলল, বাঃ, বেশ! তালের বড়া যেমন হয় তেমনি। কিন্তু এত দিয়েছ কেন সেবা? এত খেলে খিদে মরে যাবে।

এত আর কী! গামলা ভরা আরও রয়েছে।

সর্বনাশ! এত খাবে কে?

দেখ কে খায়। মঞ্চা আর পচনের আজ বড়া-মুড়ির নেমন্তন্ন। সব সাফ করে দিয়ে যাবে। পাড়ায় কিছু বিলোতেও তো হবে।

কথাটা মিথ্যেও নয়। দুই ভাইয়েরই বেশ আলিসান চেহারা। যেমন লম্বা, তেমনই নিরেট। শুধু গতর খাটালেই বা লাঙল ঠেললেই ওরকম

BanglaBook.org

শরীর হওয়ার নয়। জ্যাঠামশাই এক সময়ে গাঁয়ে ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, স্বেচ্ছাসেবক সমিতি, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি অনেক কিছু করেছেন। ওসব নিয়েই মেতে থাকতেন। জ্যাঠামশাইয়ের সেই ব্যায়ামাগারে তারা কসরত করত। তাই ওই চেহারা।

ঘরে এসে বাতি জ্বেলে ঘরোয়া পোশাক পরে আড়বাঁশিটা হাতে নিতেই দক্ষিণের খোলা জানালায় চোখ আটকে গেল তার। সেই সুন্দরী চোর জানালায় দিব্য বসে আছে। মৃদু একটু হেসে মৃদুল ডাকল, আয়।

চন্দ্রমণি গ্রাহ্যও করল না। মিটমিট করে চেয়ে তাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে লাগল। মৃদুল বলল, চুরি করিস কেন? কাল আমার খাওয়ার সময় আসিস, মাছের ভাগ দেব। চন্দ্রমণি একটা উপেক্ষার হাই তুলে লাফ দিয়ে বোধহয় আলিসায় নেমে গেল।

নাদব্রহ্ম এসে বললেন, আজ বেহাগ শোনাবে?

বেহাগ! দেখি চেষ্টা করে। বলে বাজাল মৃদুল, নিজেই মগ্ন হয়ে গেল সুরে।

যখন শেষ হল তখন নাদব্রহ্মর চোখ ছলছল করছে।

পাঁচ

কাল আর পরশু আমাদের পাড়ায় তিন তিনটে সাপ বেরিয়েছে।

মাগো! মারলি?

একটা গোখরোকে মেরেছে। আর দুটো জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

বাবাঃ, সাপের কথা শুনলে গা এমন ঘিনঘিন করে।

আমারও। রাতে বার বার বিছানা ঝেড়ে দেখি, ঢুকে পড়েছে কি না। সব ওই লোকটার জন্য।

কার জন্য?

ওই যে অলক্ষুণে লোকটা রোজ রাতে বাঁশি বাজায়। রাতে কি বাঁশি

BanglaBook.org

বাজাতে আছে বল! মা বলল, ওই বাঁশির জন্যই গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে পড়ছে।

যাঃ! সত্যি?

সত্যি নয়? আমাদের পাড়ায় কোনওদিন সাপের কথা শোনা যায়নি। লোকে তো বলে, সাপ এখন প্রায় নেই-ই। যেদিন থেকে লোকটা রাতে বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই সাপ বেরিয়ে আসা শুরু হয়েছে। বাঁশি শুনলে নাকি সাপ আর থাকতে পারে না, পাগলের মতো বেরিয়ে আসে। আমার যা ভয় করছে না!

কিন্তু সাপের তো কানই নেই। বাঁশি শুনবে কী করে? সাপ নাকি শুধু জিব দিয়ে ভাইব্রেশন টের পায়।

বইপত্রের কথা বাদ দে। বইতে যত কথা লেখা থাকে, তা কি বাস্তবে হয়? না শুনলে হঠাৎ সাপ বেরোচ্ছে কেন?

নীপা একটু ধন্দে পড়ে যায়। তার মা শশীমুখীও এরকমই একটা কী যেন বলছিলেন। রাতে বাঁশি শুনলে নাকি ছেলের মায়ের খাওয়া নষ্ট হয়।

শান্তি বেশ অসন্তুষ্ট গলায় বলল, লোকটা তন্ত্রমন্ত্র জানে কি না কে জানে বাবা! নইলে রোজ আটটা-দশটা করে ঘুড়ি কেটে দিতে পারে! আর সব সময়ে একটা অলক্ষুণে কালো ঘুড়ি ওড়ায়। আর একা একা একটা ভূতের বাড়িতে থাকে। এসব মোটেই ভাল লক্ষণ নয়।

যাঃ, মন্ত্র দিয়ে ঘুড়ি কাটা যায় নাকি? যত সব কুসংস্কার।

তুই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছিস তো, তাই কিছু মানিস না। আমার দাদা বলেছে, লোকটা অনেক কিছু জানে। নইলে ভূতের বাড়িতে থাকে কী করে?

জানা কি খারাপ?

ওসব জানা ভাল নয়। দেখলি না, গতকাল তোদের বেড়াল চন্দ্রমণি ওদের বাড়ির মাছ চুরি করে খেয়েছিল!

হ্যাঁ তো।

তার ফল কী হল বল তো। চারটে ছানার মধ্যে একটা আজ সকালে মরে গেল।

BanglaBook.org

কথাটা সত্যি। চন্দ্রমণির চারটে ছানার মধ্যে একটাকে আজ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঝি মিনতি খাটের তলা থেকে আজ সকালেই বের করেছে।

মাছ চুরির সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

আমার মনে হয় ওই লোকটাই বাণ মেরেছে।

তুই না একটা উজবুক। এখনও বাণ মারায় বিশ্বাস করিস?

যাই বলিস, লোকটাকে আমার একটুও ভাল লাগে না। চেহারাটা অবশ্য খুব সুন্দর, কিন্তু লোকটা একটা কালপ্রিট।

কোথায় দেখলি রে লোকটাকে?

ও মা! টো-টো করে ঘোরে তো। ছাদে ওঠে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আজ সকালেও ফুটবল খেলতে নেমেছিল।

আমাদের বাড়ির বড়রা সবাই ওকে চেনে। প্রত্যেকেই বলে, মৃদুলদা খুব ভাল ছেলে।

আমি তো খারাপ বলছি না। তবে ঘুড়ি কাটা, বাঁশি বাজানো ওসব কি ভাল?

ব্রহ্মদাদু তো বলে সাংঘাতিক বাঁশি বাজায়।

সে আমার বাবাও কাল রাতে বলছিল। সুর নাকি নিখুঁত। মা ধমক দিয়ে বলল, বাঁশি যত সুরে বাজবে ততই নাকি আস্তিকরা বেরোবে।

আস্তিক আবার কী রে?

রাতে সাপের নাম নিতে নেই যে!

ও তাই তো! ভুলে গিয়েছিলাম।

ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছিস তো, তাই সব ভুলে গেছিস।

না, শান্তির সঙ্গে তার ঠিক জমে না। সমানে সমানে না হলে বন্ধুত্বটা ভারী একপেশে হয়ে যায়। তবু গাঁয়ে এলে ওকেই পাওয়া যায় সব সময়ে। পরীক্ষার ফল বেরোলে সে ফিরে যাবে কলকাতায়। শান্তির বিয়ের কথা চলছে, দুম করে একদিন বিয়ে হয়ে কোথায় কোন মুলুকে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। আর দেখাই হবে না।

নীপা তার ছেলেবেলার পুতুলের বাক্স খুলে বসে গোছাচ্ছিল আজ।

BanglaBook.org

বলল, আমার কিন্তু এখনও পুতুল খেলতে ইচ্ছে করে। তোর?

শান্তি ঠোঁট উলটে বলে, আমি এখন মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজেই ভাঙ্গা ভাজা হচ্ছি, পুতুল খেলব কী? আমাদের কি কাজের লোক আছে তোদের মতো?

নীপা একটা চিনা চেহারার মেয়েপুতুল তুলে দেখছিল। তার চোদ্দো বছরের জন্মদিনে তাকে দিয়েছিল বাবা। হংকং থেকে কেনা। মুখখানা এত সুন্দর যে, কেবল চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একটা শ্বাস গোপন করে পুতুলটা বাক্সে শুইয়ে রেখে বলল, জানি তো। তুই সংসারের অনেক কাজ শিখে গেছিস, রান্নাবান্না করতে পারিস। মেয়েদের তো ওটাই সবচেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন। আমাকে যদি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তেমন সংসার করতে হয় তাহলে আমি তো পেরে উঠব না। তারা হয়তো আমাকে তাড়িয়ে দেবে। নয়তো পুড়িয়ে মারবে।

যাঃ, তোর কি আর সেই বিয়ে হবে! তোর হবে বড়লোকের বাড়িতে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছিস না! তোকে ঠিক ইংল্যান্ডের ছেলে এসে নিয়ে যাবে।

নোয়াপাড়ার সীতুপিসিকে মনে আছে তোর?

হ্যাঁ। কী সুন্দর দেখতে!

সেই সীতুপিসি এখন আমেরিকায় থাকে। বাবা কয়েকদিন সীতুপিসির বাড়িতে ছিল। তখন সীতুপিসি বাবার কাছে কত দুঃখ করেছে। দুটো ছেলেমেয়ে, তারা তো বাংলা বলেই না, বাঙালি খাবারও খায় না, দেশে আসতে চায় না। পিসি বলেছে, ওদের পেটে ধরেছি বটে, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে বলে মনেই হয় না। কেবল মনে হয়, দুটো অচেনা সাহেব-মেমের সঙ্গে এক বাড়িতে আছি। বাবা ওসব দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে। কিছুতেই বিদেশে বিয়ে দেবে না আমাকে।

এ মা! তাহলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে কী হল?

কী আবার হবে। আমারও দূরে-টুরে যেতে ইচ্ছে করে না। এমন জায়গায় থাকব যেখান থেকে টুক করে মা-বাবার কাছে চলে আসা যায়।

BanglaBook.org

হ্যাঁ রে পঞ্জাবে বিয়ে করবি?

পঞ্জাব! হঠাৎ পঞ্জাব কেন?

আমার না খুব পঞ্জাবে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেন বল তো!

কী জানি, এমনিই। মনে হয় পঞ্জাবে থাকতে পারলে বেশ হয়।

শহরে ততটা নয়, কিন্তু গাঁয়ে থাকলে বোঝা যায়, বেলা ছোট হচ্ছে একটু একটু করে, রাত বাড়ছে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে পেয়ারা গাছে এই দুপুরের রোদে কেমন যেন একটু বিকেলের রং।

বেলা হল, যাই রে! বলে শান্তি উঠে পড়ল।

মা বকবে বুঝি!

না। তোর কাছে এলে বকে না। বলে ও তো ভাল মেয়ে, ওর কাছে গেলে ইংরেজি-টিংরেজি শিখতে পারবি।

যাঃ, আমার অত বিদ্যে নেই।

শান্তি চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ পুতুলের সংসার সাজাল সে। তার অনেক পুতুল। টেডি বিয়ার থেকে সবরকম। কলের পুতুলও আছে বেশ ক'টা।

মা এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, তোর ব্যাপারটা কী বলবি?

খুব নিরীহ মুখে নীপা বলে, কী হয়েছে মা?

কী হয়েছে! কলঘরে আংটি ফেলে এসেছে কে?

জিব কেটে নীপা বলল, সরি মা, ভুল হয়ে গেছে।

এটা নিয়ে ক'টা হারালি বল তো! সোনা হারানো যে খারাপ সেটা খেয়াল আছে? বেশি বেশি পাচ্ছ কি না তাই হারালে গায়ে লাগে না। আংটি আঙুল থেকে খুলতে তোকে ব্রজঠাকুর বারণ করে গেছে না? শনির নজরের জন্য দেওয়া। তা মেয়ের কি কোনও আক্কেল আছে? যখন তখন খুলে ফেলছে আঙুল থেকে।

মনে থাকে না যে! আঙটির পিছনে ময়লা জমে গিয়েছিল। পরিষ্কার করতে খুলেছিলাম।

BanglaBook.org

দয়া করে আর খুলো না, অনেক দামের আংটি।

আংটিটা পরে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের হাতখানা একটু দেখল সে। হাতটা সরাতেই একজনের চোখে চোখ পড়ে গেল তার। চন্দ্রমণি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে তাকে দেখছে।

নীপা অবাক হয়ে দেখে, চন্দ্রমণির গলায় একটা লাল টুকটুকে বকলশ ভেলভেট দিয়ে তৈরি। ঝুপ করে উবু হয়ে বসে চন্দ্রমণিকে কাছে টেনে এনে বকলশটা ভাল করে দেখল নীপা। ভেলক্রো দেওয়া ব্যান্ড বেশ চওড়া। যত দূর মনে হয় এটা একটা রিস্ট ব্যান্ড!

ওমা! এটা কে পরাল তোকে? এ তো দামি জিনিস!

গলাটা একটু চড়ে গিয়েছিল নীপার। শশীমুখী এসে বললেন, কী হয়েছে রে?

দেখ কাণ্ড! কে ওর গলায় একটা ব্যান্ড পরিয়ে দিয়েছে।

আবার কোন নাগর জুটিয়েছে দেখ। ওর কি চরিত্রের ঠিক আছে!

তুমি যেন কী! ওর বয়ফ্রেন্ড কি ওকে ব্যান্ড পরাবে নাকি? দাঁড়াও দেখছি।

বলে ব্যান্ডটা খুলে উলটে-পালটে দেখল নীপা। রিস্ট ব্যান্ডই বটে। ভিতর দিকে একটা স্টিকার লাগানো। তাতে লেখা মেড ইন তাইওয়ান, দাম পাঁচ ডলার।

সর্বনাশ! এ তো বেশ দামি জিনিস! তার ওপর বিদেশি। কে পরাল বলো তো!

সর্বনাশী তো আর ছলাকলা কম জানে না। তাতে মজে গিয়ে কেউ হয়তো পরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ রে, মৃদুল নয় তো!

মৃদুলদা! পরশুই না মৃদুলদাদের মাছ চুরি করেছিল!

করলে কী হবে। মৃদুল নাকি পাত্তা দেয়নি। বরং আমাদের কাছে নালিশ করায় সেবার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। মৃদুলই পরিয়েছে।

ও মা! কেন?

হয়তো বেড়াল ভালবাসে। মুখপুড়ি চোর হোক আর যাই হোক, রূপ তো আছে।

BanglaBook.org

তা বলে পাঁচ ডলার দামের ব্যান্ড! টাকার হিসেবে দুশো টাকার ওপর।

তাহলে বাপু ফেরত দেওয়াই উচিত।

না মা, সেটা ভাল দেখাবে না। আদর করে যদি দিয়ে থাকে তবে থাক।

সে-ই দিয়েছে কি না সেটা তো জানা দরকার।

লক্ষ্মীদিকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো!

তার দরকার কী? ওই তো দু' পা দূরে রায়বাড়ি, গিয়ে এক ফাঁকে মৃদুলকেই তো জিগ্যেস করে আসতে পারিস।

না বাবা, আমার লজ্জা করে।

ওমা! লজ্জার কী!

ব্যান্ডটা আবার চন্দ্রমণির গলায় পরিয়ে দিয়ে নীপা বলল, বেশ মানিয়েছে কিন্তু। রূপ খুলেছে।

রূপ ধুয়ে জল খা। একটা ছানা তো আজ মরেছে। বেড়াল মরা মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। ব্রজ ভট্‌চাযকে খবর পাঠিয়েছি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না কে জানে। পাড়া-ঢলানি বেড়াল, বাচ্চা বিইয়েছে তো গেরাহ্যিই নেই। গ্যাদড়া ন্যাদোস বাচ্চা, এখন মায়ের ওম না হলে কি ওদের চলে? তা কোথায় কী, উনি পাড়া ঢলে বেড়াচ্ছেন, যত দায় এখন আমাদের।

চন্দ্রমণি দুষ্টু, লোভী, অলস এবং ছেনাল এ সবাই জানে। তবু তাকে কিন্তু এক ডাকে সবাই চেনে। এ গাঁয়ে চন্দ্রমণির মতো বিখ্যাত বেড়াল আর কেউ নয়। আর কে না জানে, বিখ্যাত হতে গেলে একটু অন্য রকম হতেই হয়।

আর একটা অন্যরকমের খবর নীপা পেল পর দিন সকালে। চন্দ্রমণির গলার পাঁচ ডলার দামের ব্যান্ডটা খুলে নিয়ে নিজের সাইকেলটিতে চেপে রায়বাড়িতে যখন হানা দিল।

মৃদুলদা আছে?

লক্ষ্মীদি মোচা কাটছিল, মুখ তুলে হেসে বলল, কাল রিহার্সালে এলি না!

BanglaBook.org

না তো। কাল বড্ড মাথা ধরেছিল বিকেলবেলায়।

আয়, বোস।

কী করছ লক্ষ্মীদি?

কী আর করব! শত হলেও অতিথি, অযত্ন যাতে না হয় দেখছি।

অতিথি আবার কী? এটা তো মৃদুলদার নিজের বাড়ি।

তা ঠিক। তবে এখানে আর ক' বছর ছিল বল। সেই ছেলেবেলায়। মৃদুলকে খুঁজছিস কেন?

একটা কাণ্ড হয়েছে।

কী কাণ্ড?

চন্দ্রমণির গলায় কে যেন এই ব্যান্ডটা পরিয়ে দিয়েছিল কাল। বিদেশি জিনিস, পাঁচ ডলার দাম। চন্দ্রমণি মাছ চুরি করে বটে, কিন্তু ব্যান্ড তো আর চুরি করেনি। আমার মা বলল, হয়তো মৃদুলদা পরিয়েছে।

অসম্ভব নয়। দু'দিন ধরে দেখছি মৃদুলের জানালায় বসে আছে চুপ করে। আজ সকালে নাকি মৃদুল ওকে প্লেটে ঢেলে একটু চাও দিয়েছিল, সেটা খুব চেটেপুটে খেয়েছে। দেখে সেবার সে কী রাগ!

নীপা হেসে ফেলল, বলল, চন্দ্রমণির ওপর সকলের রাগ। কিন্তু ও তো একটা মজার বেড়াল, তাই না?

আমাদের বাড়িতেও যায়। বাবার পাশেই শুয়ে থাকে, দেখেছি।

ব্যান্ডটার কথা মৃদুলদাকে একটু জিগ্যেস করা যাবে? দামি ব্যান্ড তো! উনি পরিয়েছেন কিনা সেটা তো জানা দরকার।

একটু বোস। এসে যাবে।

বাড়িতে নেই বুঝি?

মঞ্জা আর পচনের সঙ্গে সাতসকালে খেতে গেছে। গাঁয়ের দিকে একটু টান হয়েছে দেখছি। কী খাবি বল তো! গরম গরম দুটো মোচার চপ ভেজে দিই?

উঃ, খা-খা করে পাগল করে দিতে পারও তোমরা। বাড়িতে সারাক্ষণ মা এটা-ওটা এনে সাধাসাধি করছে, পাড়ার কোনও বাড়িতে গেলেই খাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি। কত খাব বলো তো!

BanglaBook.org

লক্ষ্মী একটু হেসে বলল, সকালে কী খেয়েছিস?

লুচি।

ও বাবা! লুচি! সুয্যিঠাকুর আজ কোন দিক দিয়ে উদয় হলেন!

ডায়েটিং করি বলে ঠাট্টা করছ তো! না করলে এতদিনে হাতির মতো মোটা হয়ে যেতাম। আজ কিন্তু সত্যিই লুচি খেয়েছি।

ক'টা শুনি।

নীপা হেসে ফেলল, বলল, একটা।

বাড়াবাড়ি করলে অসুখে পড়বি। তুই সকালে পাঁচশো স্কিপিং করিস, স্পট জগিং করিস, ট্রেডমিল করিস, তাহলে খাস না কেন? ব্যায়াম করলে খেতে ভয় কী?

বাঃ, দুধ খেতে হয়নি? কত বড় গেলাসের এক গেলাস।

খাস না বলেই দিন দিন চিমসে হচ্ছিস।

চিমসেই ভাল। মোটা হওয়া তো সোজা। রোগা হতে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়। আচ্ছা, তুমি যে এত খাওয়ার কথা বলছ, তুমিই কি খাও? মাছ মাংস খাও না, পেঁয়াজ রসুন অবধি ছেড়েছ।

আমার ওসব ভাল লাগে না।

আচ্ছা লক্ষ্মীদি, এ বাড়িতে কি ভূত আছে?

কেন রে?

অনেকেই কিন্তু বলে।

কী বলে?

ছাদে নাকি কাকে দেখা যায়।

তোর তো শুনি বেজায় ভূতের ভয়।

ও বাবা, সাংঘাতিক। বলো না, আছে?

ভূত থাক বা না থাক, তোর ভয়টা তো যাবে না।

তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ কিন্তু।

আমি কী করে বলব বল তো! আমি তো দেখিনি।

কোনওদিন দেখোনি?

না রে। গাঁয়ের লোক কত কী বলে।

BanglaBook.org

তা হোক, আমি কিন্তু এ বাড়িতে থাকতে পারব না বাবা।

সেবা পটলের দোলমা সাঁতলাতে সাঁতলাতে একটু হেসে বলল, অনেক ঘর ফাঁকা আছে কিন্তু।

ভ্যাট।

ছয়

কেউ যদি আমার জন্য দেবদাস হয়ে যায় তাহলে আমার কিছু করার নেই। আমি এমন কিছু একটা মেয়ে নই যার জন্য একজন আখাম্বা পুরুষ নিজের জীবনটা নষ্ট করবে। না রূপ, না গুণ কোনওটাই কি ছিল আমার! তার ওপর লোকের চোখে নষ্টা।

দেবদাস হতে যাব কেন? আমি তো বেশ আছি।

মোটেই বেশ নেই। ব্যাচেলারদের যত বয়স হয় তত সমস্যা দেখা দেয়। একজন লোক কেন আমার জন্য কষ্ট পাবে সেটা ভেবে আমার অপরাধবোধ হয়।

ভাববার দরকার কী?

না ভেবে উপায় আছে? চোখের সামনে একজনকে রোজ দেখছি কষ্ট পাচ্ছে, ভাবব না?

কষ্টটা তোমার কল্পনা, আমার কষ্ট কীসের?

বয়স তো বেশি হয়নি, এবার সংসারী হও।

ইচ্ছে করলেই হওয়া যায় বুঝি!

ইচ্ছেটা তো আগে হোক।

হলে বলব তোমাকে।

এতে হয়তো আমার পাপও হচ্ছে।

পাপ-পুণ্যের ব্যাপারটা আমার জানা নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ এসব কথা উঠছে কেন?

উঠছে, কারণ এখন আর দেবদাসদের যুগ নেই। কেউ কারও জন্য

BanglaBook.org

বোকার মতো নিজের জীবন নষ্ট করে না। আমাদের সেই বয়সটাও নেই। শেষ পর্যন্ত এটা বোকামি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজেকে ক্ষয় করার মধ্যে মহত্ত্ব নেই।

ওরে বাবা, অত বড় বড় কথা কি আমি বুঝতে পারি? আমি বিষয়ী লোক। টাকাপয়সা, শেয়ার বাজার, লগ্নি নিয়ে সারা দিন মাথা ঘামাই। ওসব ভাবের কথা আমার মাথায় আসে না।

নিজেকে আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না। আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি। নিজের ওপরেই রাগ হয়। কেন যে তুমি এরকম করছ বুঝতে পারছি না। মোহ থাকলে সেটা এতদিনে কেটে যাওয়ার কথা। কেন কাটছে না?

তোমারও তো কাটল না!

ভুল বললে, আমারটা মোহ নয়।

তবে কি প্রেম?

তাও বা বলি কী করে? বলতে পারো আনুগত্য। আমি যেন একজন পুরুষের জন্যই জন্মেছিলাম।

এ যুগের কথা বলছিলে না! এ যুগে কেউ বিশেষ কারও জন্য জন্মায়, না সারা জীবন একজনের জন্য জীবন ক্ষয় করে?

তুমি ওকালতি পাস, অনেক কথা জানো। আমি জানি না। শুধু জানি আমার উপায় ছিল না।

আমি তো তোমাকে ওসব নিয়ে প্রশ্ন করিনি! তুমি একটা ব্রত ধারণ করে আছ বলেই মনে করি। তুমি যদি পার, আমিই বা পারব না কেন?

কেন বুঝছ না, এই জন্য আমার মনে কত অশান্তি! রাতে মাঝে মাঝে আমার ঘুম হয় না। আমি সামান্য একটা মেয়ে, আমাকে এত মূল্য দিচ্ছে কেউ, এটা ভাবতে যে ভয় পাই।

আমার তো মূল্য নিয়েই কারবার। দিন-রাত দরদাম নিয়েই মাথা ঘামাই। কোনটার কী মূল্য সেটা আমি আমার মতো করে বুঝি। সব জিনিসের দাম কি শুধু প্রাইস ট্যাগ দিয়ে বোঝা যায়?

আমি জানি, বরাবর জানি তুমি গোঁয়ার গোবিন্দ আর ভীষণ বোকা। তোমার বোকামির ফল যদি শুধু তোমাকে ভোগ করতে হত তাহলে

BanglaBook.org

কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সেই বোকামির ফল আজকাল আমাকেও ভোগ করতে হচ্ছে।

চোখের সামনে আছি বলেই যদি তোমার এত রি-অ্যাকশন হয়, তাহলে যদি চাও তো, দূরে সরে যেতে পারি। এই গাঁয়ের বসত উঠিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে আমার বেশি সময় লাগবে না।

বেশ কথা তো! তাতে কি তোমার অবস্থান আর মনোভাব পালটে যাবে? তুমি জানো না, আজকাল তোমাকে আমি একটু একটু ভয় পাই।

আমাকে ভয়! আমাকে আবার ভয় কীসের? আমি তো ভাল লোক।

না, তুমি একদম ভাল লোক নও। আমার পক্ষে তুমি অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। কারণ তুমি আমার মনের কথা টের পাও। তোমাকে কেউ কোনওদিন কিছু বলেনি, অথচ তুমি আমার সব সিক্রেট জেনে গেছ। এইটেই সবচেয়ে ভয়ের।

দীননাথ মৃদু হাসল। হতাশায় মাথা নাড়া দিয়ে বলল, ভুল। তোমাকে আমি আজও ভাল বুঝতে পারি না।

জ্যোৎস্নায় হাঁটছে তারা। নির্জন পথ। গাছের ছায়ায় নকশাদার অপরূপ আলো-আঁধারি।

তুমি একদিন সন্ধেবেলায় বাবার সঙ্গে বসে গল্প করছিলে। আমি তোমার পিছন দিকে, একটু দূরে মোড়ায় বসেছিলাম। সেদিন দুপুরে আমার হাতঘড়িটা হাত থেকে পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য মনটা খারাপ ছিল। ঘটনাটা কাউকে বলিনি। আমি ছাড়া কেউ জানেও না। হঠাৎ তুমি আমার দিকে ফিরে বললে, ঘড়িটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আমাকে দাও, কলকাতা থেকে সারিয়ে এনে দেব। আমি তোমার দিকে ভূত দেখার মতো করে চেয়েছিলাম। এমন চমকে দিয়েছিলে আমাকে।

দীননাথ ফের একটু হেসে বলল, এ তো সহজ ডিডাকশন। তোমার মনটা খারাপ দেখে ভেবেছিলাম, কিছু একটা হয়েছে। কী কী হতে পারে তা অনুমান করে বাই দি প্রসেস অফ এলিমিনেশন—

বাজে কথা বোলো না। আমি বাচ্চা মেয়ে নই যে, যা খুশি বুঝিয়ে দেবে।

BanglaBook.org

ঠিক আছে। তাহলে ধরে নাও আমি থটরিডিং জানি।

তুমি কী জানো, আর কী জানো না তা আমি আর বুঝতে পারি না। কাটোয়া থেকে ফেরার সময় তুমি সঙ্গী ছিলে। মনে আছে? কিছু কেনাকাটা করেছিলাম। একটা জিনিস কেনার খুব শখ হয়েছিল, কিন্তু পয়সার টান ছিল বলে কেনা হয়নি। পাছে তুমি আগ বাড়িয়ে কিনে দাও সেজন্য আড়চোখে এক-আধবার দোকানে জিনিসটা লক্ষ করেছি কিন্তু ইচ্ছে করেই হাতে নিইনি বা মন্তব্য করিনি। ট্রেনে বসে জিনিসটার কথা ভেবে একটু খারাপ লাগছিল। তুমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলে। হঠাৎ আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, তিন খোপের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগটা তো। পরশু আমি কাটোয়ায় আসব, তখন কিনে নিয়ে যাব। তুমি নিশ্চয়ই এ ঘটনারও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবে! প্লিজ, কোরো না।

ব্যাখ্যার কিছু নেই।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা তুমি প্রদ্যুম্নর বাবার নাম জান, যা আর কেউ জানে না। আমার পক্ষে তুমি কতখানি বিপজ্জনক তা বুঝতে পারছ? অমন করে হেসো না। একটা মানুষকে রোজ দেখছি, কথা কইছি, মিশছি, কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা কুয়াশার মতো কিছু থেকে যায় তাহলে ভয় ভয় করে কি না বলো!

আমি সারা দিন উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াই, খেটেপিটে খাই, আমার মধ্যে কুয়াশা কী করে থাকবে লক্ষ্মী?

একটু আগে আমরা যখন পাশাপাশি হেঁটে আসছি, তখন কোথাও কিছু না, তুমি হঠাৎ বলে উঠলে, হ্যাঁ, বেশ হয় তাহলে। কেন বললে বলো তো!

বলেছি নাকি?

মনে নেই?

এমনিই বলেছি হয়তো, কিছু একটা গভীরভাবে ভাবছিলাম বোধ হয়।

ঢাকাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করো না। ধারে-কাছে কেউ নেই, আমিও কিছু বলিনি, চুপচাপ আসছি, হঠাৎ তুমি বলে উঠলে, হ্যাঁ, বেশ হয় তাহলে?

BanglaBook.org

আজ তোমাকে কিছু একটা ভর করেছে।

করেছে। তবে আমাকে নয়, তোমাকে। কথাটা তুমি এমনি বলনি। কথাটা বলেছ আমার মনের কথা শুনতে পেয়েছ বলে।

কী কথা?

আমি মনে মনে একটা বিশেষ ছেলের সঙ্গে একটা বিশেষ মেয়ের বিয়ে হলে কেমন হয় সেটা খুব গভীরভাবে ভাবছিলাম। ঠিক তখনই তুমি ওই কথা বললে।

দীননাথ ফের হতাশায় মাথা নাড়া দিয়ে বলল, ও তোমার মনের ভুল।

দেখ দীনুদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিচ্ছে। আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি। কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, তোমাকেও একদিন ভয় করবে আমার। এবার সত্যি করে বলো তো, কেন বললে কথাটা! আমি কাদের কথা ভাবছিলাম?

কী বিপদ! তুমি কি আমাকে সিদ্ধাই ঠাওরালে?

ঠিক আছে, বোলো না। কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার ভয় ভয় ভাবটা আরও বাড়ল। তুমি আমার কাছে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠলে। এর পর তোমাকে দেখলেই আমি দৌড়ে পালাব।

দীননাথ শান্ত, ব্যথাতুর গলায় বলল, তুমি তো বরাবর আমার কাছ থেকে পালিয়েই আছ। কোনওদিন তো তাড়া করিনি তোমায়।

না, তা তুমি কখনওই করোনি।

আমি শুধু তোমার ছায়ায় ছায়ায় একটু হেঁটেছি। তার বেশি তো কিছু নয়।

ওভাবে বোলো না। আমার কষ্ট হয়।

আরে না, সেভাবে বলিনি।

আমি কাদের কথা ভাবছিলাম জান?

আন্দাজ করতে পারি।

আন্দাজ নয় দীনুদা, তুমি জান। তুমি আমার মনের কথা টের পাও। কেন স্বীকার করছ না?

BanglaBook.org

বাড়িতে ঢুকবার মুখে দু'জনেই দেখতে পেল হরপ্রসন্ন অন্ধকার বারান্দায় জ্যোৎস্নায় অংশত দৃশ্যমান। কাকে যেন আহ্লাদের গলায় বলছেন, এ দিকটায় এবার জল ভাল হয়েছে মশাই, তাই ফলনটাও এবার তেজি। চাষবাসের কিছু বোঝো! চাষের বড় ঝক্কি মশাই, তবে ফসল যখন ওঠে তখন আর মনে থাকে না কিছু। তা দেখলে সব ঘুরে ঘুরে?

হ্যাঁ। অনেকটা জমি।

চার-পাঁচজনের নামে আছে, আলাদা দলিলে। দলিল বড় জটিল জিনিস। ওসব দীনু ভাল বোঝে।

আগল ঠেলে লক্ষ্মী ঢুকতেই হরপ্রসন্ন বললেন, লক্ষ্মী এলি? মশাইকে একটু চা দে।

লক্ষ্মী একটু মৃদু ধমক দিয়ে বলে, আচ্ছা, ও তোমার ছেলের বয়সি, ওকে তোমার মশাই-টশাই বলার দরকারটা কী? নাম ধরে ডাকলেই তো হয়।

ওরে বাবা! বিদ্যাবান লোক, সাহেবদের দেশে থাকে!

তাতে কী! মৃদুল ভাল ছেলে, মোটেই সাহেব হয়ে যায়নি।

হরপ্রসন্ন খুশির গলায় বললেন, আয় দীনু, বোস।

দীনু টুল টেনে বসে মৃদুলকে বলল, খেতখামার দেখতে গিয়েছিলি নাকি?

হ্যাঁ দীনুদা। কতটা জমি আমাদের! দেখে ভারী অবাক লাগল।

কেন রে, অবাক হওয়ার কী? ও তো বহুকাল ধরে তোদের।

আমরা যে এতটা জমির মালিক তা ভুলেই গিয়েছিলাম। আর ধান যা হয়েছে, চোখ জুড়িয়ে যায়। ধানের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছ। মঞ্চা আর পচনের সঙ্গে খেতের ভিতর দিয়ে আল ধরে অনেকটা ঘুরলাম।

মঞ্চা আর পচনের বাপ-দাদাও তোদের জমি চষত। এই নিয়ে তিন পুরুষ।

হ্যাঁ, ওরাও বলছিল। বলছিল, বেচবেন কেন? জমি কি বেচতে আছে? বিক্রি হলে কি ওদের কাজ চলে যাবে?

BanglaBook.org

না। রেজিস্ট্রি আছে।

হরপ্রসন্ন বললেন, কী আর করবে মশাই। গোবিন্দদা আগলে আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু দূরে থাকো, এসব রক্ষে করে কে? তবে ধান ওঠার পর ফসলওলা জমি বেচে দেওয়া ভাল নয়।

ভাবছি।

ভাব মশাই, খুব ভাব। বিদ্যাবান লোক তুমি, মাথা উর্বর।

লক্ষ্মী চা নিয়ে এল।

বাবা, তুমি কি চা খাবে এখন?

দিস একটু। খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না আজকাল বুঝলি দীনু। আগে বিড়ি সিগারেট টেনেছি খুব, এখন আর ইচ্ছে যায় না। ইচ্ছেগুলোই সব উড়ে উড়ে চলে গেল যেন। কোনও কিছুই ইচ্ছে হয় না কেন বল তো!

বেরটের হন না কেন?

ওই তো ইচ্ছের অভাব। বসে পড়লে মনে হয় বসেই থাকি। সেই বিকেল থেকে যে বসা দিয়েছি বাপ, একবার পেচ্ছাপ করতেও উঠিনি। বসে হাঁ করে চেয়ে আছি। দেখছি যে, তাও যেন নয়।

দীনু বলে, বয়স তো আপনার মাত্র ছিয়াত্তর হল। এখনই কি মরার কথা ভাবেন নাকি?

ওরে না। সেসব আমার মনেই হয় না। এই এদিকপানে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি, একবার যে ওদিকপানে তাকাব তাও যেন ইচ্ছে যায় না। ওইটে নিয়ে ভাবি।

চা খেয়ে মৃদুল উঠল, আজ আসি। অনেক হাঁটাহাঁটি গেছে।

তাকে উঠোনটা এগিয়ে দিতে এসে লক্ষ্মী বলল, চন্দ্রমণির গলায় একটা লাল টুকটুকে ব্যান্ড পরিয়েছিল কে বলো তো! তুমি নারি?

মৃদুল হেসে বলল, হ্যাঁ। বেড়ালটা আমার কাছ ঘেঁষে এসে দিব্যি বসে রইল। তখন কী মনে করে গলায় ওটা পরিয়ে দিয়েছিলাম। কেন লক্ষ্মীদি, ওরা কিছু মনে করেছে?

মৃদু হেসে লক্ষ্মী বলে, মনে করবে কেন? তবে ব্যান্ডটার নাকি অনেক দাম! পাঁচ ডলার। তাই নীপা ভয় পেয়ে ওটা ফেরত দিতে এসেছিল।

BanglaBook.org

দামটাম তো জানি না। আর ওদেশে পাঁচ ডলার মানে খুব বেশি দাম বোঝায় না। ফেরত দেওয়ার কিছু নেই। পছন্দ না হলে খুলে ফেললেই হল। নীপা কে?

বিলোচনের ছোট মেয়ে। বি.এ ফাইনাল দিয়ে এসেছে। এবার এম.এ পড়তে যাবে।

ও।

তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিল। তুমি বাড়ি ছিলে না।

ওকে বলে দিয়ো, ওদের বেড়ালটা খুব সুন্দর। আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে।

নীপাও সুন্দর।

মৃদুল মৃদু একটু হেসে চলে গেল।

জ্যোৎস্নায় ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে উঠোন। জ্যোৎস্নায় ডুবে যাচ্ছে পা। এত জ্যোৎস্না যেন কখনও আগে দেখেনি লক্ষ্মী। আঁজলা ভরে তুলে মুখে নেওয়া যায়। কুলকুচি করে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

বারান্দায় দু'জন বিষয়ী লোক কথা বলছে। অনেকক্ষণ কথা হবে তাদের। কী রস পায় কে জানে। উঠোন জুড়ে জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল লক্ষ্মী। আজ ঠিক পরিরা নামবে। শিউলির মাদক গন্ধ গোপনে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

দীননাথ উঠোনে নামল।

ঘরে যাও। এ সময়ে হিম পড়ে।

শোনো, বাবা কি কখনও তোমাকে বলেছে, লক্ষ্মীকে বিয়ে কর।

প্রায়ই বলেন।

আমাকেও বলে। আমার মনে হয় বাবা মরে গেলে আমার কী হবে সেই চিন্তাতেই বাবা কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি তো একা নই। আমার একটা ছেলে আছে। ধা করে বড় হয়ে যাবে। সেই তো আমাকে দেখবে। যদিও না দেখলেও ক্ষতি নেই।

BanglaBook.org

মেয়েদের আগেকার যুগ যে আর নেই এটা হরজ্যাঠা জানেন। তবু বাপের মন তো।

দীনুদা, তোমাকে একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে।

বলো।

বলব?

দীননাথ মৃদু হেসে বলল, এ জন্মে হল না, কিন্তু যদি জন্মান্তর থাকে—তাই না?

লক্ষ্মী স্তম্ভিত বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল, তারপর স্খলিত কণ্ঠে বলল, কী করে—কী করে তুমি টের পাও?

দীননাথ আর দাঁড়াল না। সামনের জ্যোৎস্নায় ডুবন্ত পথে গাছগাছালির ইকড়িমিকড়ি ছায়ায় ছায়ায় বিষণ্ণ পা ফেলে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, ততক্ষণ চেয়ে রইল লক্ষ্মী।

রাতে হরপ্রসন্নকে খই দুধ খেতে দিয়ে লক্ষ্মী পায়ের কাছটিতে বসে বলল, বাবা, তুমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ?

হরপ্রসন্ন অবাক চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, বুড়ো হতে আর বাকি কী রে? খুনখুনে হয়ে গেছি।

এত তাড়াতাড়ি তোমার বুড়ো হওয়ার কী? তুমি মরলে কি আমিই বাঁচব নাকি?

এ তো ভারী মজা! বাপ বুড়ো হয়, মরে, সন্তানের মধ্যে বেঁচেও থাকে, মায়া কাটিয়ে ফেল মা।

না বাবা, তুমি মরো না। আমি সহ্য করতে পারব না।

দুর পাগল! কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

আজ আমার মনটা বড় খারাপ।

তা মনের খারাপ-ভাল তো আছেই। এ বেলা ভাল তো ও বেলা খারাপ। মেঘলা দিনে খারাপ তো রোদ উঠলে ভাল। মন নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? ছেলেটার কথা কি ভুলে যাস মা? ছেলেটার কথা ভাবিস, মন ভাল থাকবে।

এই তো তুমি আর ওই ছেলেটা, এই নিয়েই আমার জগৎ। অল্পেই

BanglaBook.org

ফুরিয়ে যাওয়া একটুখানি জীবন। আর কে আছে আমার বলো।

দীনু আছে। তাকে দূর ছাই করতে যাস না। তাকে গ্রাহ্যি করলি না, প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলি, তা না হয় হল। কিন্তু তোর এত বড় বন্ধু আর নেই।

জানি বাবা, জানি। দীনুদাকে দূর ছাই করি আর যাই করি, সে যে সামান্য মানুষ নয় তা টের পাই। তবু সে তো বাইরের মানুষ।

হরপ্রসন্ন একটা বিষম খেলেন। আজকাল এই বিষম খাওয়ার একটা উৎপাত হয়েছে। চোখে জল এসে গিয়েছিল। ধুতির খুঁটে সেটা মুছে খইয়ের বাটিটা মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, আর খেতে পারছি না।

ওমা! কতটুকু খেলে!

খেতে ইচ্ছে যায় না রে! জিবে স্বাদসোয়াদ নেই। খিদে হয় না।

এমন হচ্ছে কেন তোমার?

কে জানে।

কাল একবার ডাক্তারকে খবর দেব।

দূর দূর। এ ডাক্তারের কাজ নয়। শরীরে তো কোনও ব্যাধি নেই, শুধু ইচ্ছেগুলো নেই।

বাবার প্রসাদটুকু খেয়ে যখন জল খাচ্ছে লক্ষ্মী তখন হরপ্রসন্ন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ মা, তুই কি বৈধব্য পালন করিস? আঁশ খাস না, রাতে খই-দুধ!

লক্ষ্মী জবাব দিল না। তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

আড়বাঁশির এক সম্মোহক শিহরন দুলিয়ে দিচ্ছে জ্যোৎস্নায় মদির রাত। ওই ফিনফিনে পাখনায় উড়ে উড়ে নেমে আসছে পরি। ছাতিম ফুলের মাদক গন্ধ লুট করে নিয়ে যায় চোর বাতাস। আর সেই সময়ে ধুলোয় হীনতা ছেড়ে ফণা তোলে সাপ। পথের মাঝখানে।

দীননাথ দাঁড়ায়। কানে বাঁশির শব্দ, পথ জুড়ে সাপ, ছাতিমের ভেজা গন্ধ আসছে নাকে। কী মোহময় মৃত্যুর আবহ। দীননাথের জন্য কি এত আয়োজনের দরকার ছিল? আরও কত তুচ্ছ, ধুলোটে মৃত্যু হতে পারত তার! কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসছিল দীননাথের। আজ চাঁদের আলোয়, অমন পাগল-বাঁশির সুর শুনতে শুনতে, নাকে শিউলি আর

BanglaBook.org

ছাতিমের গন্ধ ভরে ধুলোর ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বড় ভাল লাগবে তার। একটু আকস্মিক, একটু অপ্রত্যাশিত। তা হোক, এও কিছু খারাপ হল না। সে পালাবে না, চেঁচাবে না। নিজেকে এগিয়ে দেবে শুধু। এত আয়োজন কি বৃথা হতে দেওয়া যায়!

দীনু নাকি রে! অ দীনু, একটা সুঁটকি মাগির জন্য জীবনটা পাত করলি বাপ! একটা মেয়েছেলের জন্য... একটা মেয়েছেলের জন্য কি এত করা যায় নাকি? শাজাহান হলি শালা! শেষে শাজাহান হলি! তোর দুঃখে রোজ আমি গলাজলে নামি।... গঙ্গাজল... পাদোদক... আজকাল কিক মারে না। বলি কী, একটা রক্তমাংসের মেয়েমানুষই তো! নাকি! তার দোষঘাট আছে, বাহ্যে-পেচ্ছাপ আছে, রোগভোগ আছে, পাপ-তাপ আছে... সেই মেয়েমানুষের দাম কত চড়িয়ে দিলি বল তো! অ্যাঁ...

সাপ! সাপ!

কোথায় সাপ! কোথায় শালা সাপ!

বোধহয় সাপও জানে যে, মাতালের কোনও ভয়ডর নেই। সে সসম্মানে শিব নস্করের পথ ছেড়ে নেমে গেল। আজও শিববাবুর শিবনেত্র, শিবের মতোই ন্যালাভোলা অবস্থা, কাছা লুটোচ্ছে ধুলোয়, কোঁচা স্খলিত মুঠিতে মরা মুরগির মতো ঘাড় লটকে আছে, পাঞ্জাবিটা ঘাড়ে, গায়ের স্যান্ডোগেঞ্জিটা গুটিয়ে বুক পর্যন্ত তোলা, নালঝোল গড়াচ্ছে মুখ দিয়ে।

বাড়ি পৌঁছে দিই জ্যাঠা?

দুশ্ শালা! বাড়ি কি আমি চিনি না নাকি? শিবু নস্কর সব চেনে।... শুধু ওই বাঁশিটা আর এই জোছনায় সব গুলিয়ে দিচ্ছে, বুঝলি। বাঁশিটা থামলে সব ঠিক হয়ে যাবে। জোছনাটা নেবাতে বল না বাপ, পথের ঠাহর পাই না যে!

টলতে টলতে শিব নস্কর চলে যাচ্ছে। অবিরল কথা কইছে। লালা ঝরছে। চোখের জলও।

দীননাথ শূন্য পথটার দিকে চেয়ে রইল একটু। প্রশ্নচিহ্নের মতো সাপটা একটু আগেই পথ জুড়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল তার। এখন নেই।

BanglaBook.org

বারবার এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসবে না জীবনে।

একটা শ্বাস ফেলে দীননাথ একা একা ফিরতে লাগল।

সে হিসেবের মানুষ, ডেবিট ক্রেডিট না মিললে তার সোয়াস্তি নেই। কিন্তু এই একটা হিসেব কিছুতেই মিলতে চায় না। ওই একজনকে ঘিরে তার ক্লান্তিহীন আহ্নিক গতি।

রাগরাগিণী চেনে না দীননাথ। কিন্তু বড় ভাল বাঁশি বাজায় ছেলেটা। এ কি কোনও কান্নার সুর? কাউকে ডাকে? কাকে ডাকিস মৃদুল? ডাকিস না কাউকে। দুঃখ পাবি।

সাত

শ্যামা বিভোর হয়ে নাচে। খঞ্জনাপাখির মতো নৃত্যপর দু'খানি পায়ে, দুটি লতানো হাতে, নমনীয় শরীরের নানা বাঁকে বাঁকে ফুটে ওঠে তার কথা। তার গোপন কথা। মুখে ঘাম, নাসারন্ধ্র স্ফীত, শ্বাস দ্রুত, চোখে সম্মোহন। সে এই সময়ে নেই, এখানেও নেই। সে রয়েছে এক মায়ার জগতে, কোনও প্রাচীন সময়ে, গানে ছন্দে তালে তার দেহখানি মৃদঙ্গের মতো ধ্বনিময়।

রিহার্সাল থামালেও কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে রইল নীপা। যেন গভীর নীলাভ জলের মধ্যে ডুবে আছে।

রিহার্সালের পর যেমন হয়, ঘরভরতি মেয়েরা এক সঙ্গে কথা কইছে, হাসছে, চেঁচামেচি হচ্ছে। এল চা। স্বপ্নের উঁচু থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীপা। ফুলঝুরি তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, তোর ভর হয় নাকি রে?

যাঃ! কী সব আজেবাজে কথা!

না রে। আমাদের পাড়ার মাধুর মায়ের ওপর কালীর ভর হয়। তখন চোখটোখ ঘোলাটে হয়ে কেমন অন্যরকম মানুষ বলে মনে হয়।

অ্যাই, মারব থাপ্পড়! আমার চোখ কি ঘোলাটে?

BanglaBook.org

তা নয়। কিন্তু তোকে কেমন যেন অন্য মেয়ের মতো লাগছিল।

অভিনয়-টভিনয় করলে ওরকম হয়। ভর আবার কী?

অন্য পাশ থেকে শান্তি বলল, স্টেজে তোকে কী পোশাক পরাবে রে? নিশ্চয়ই বেনারসি!

ঠোঁট উলটে নীপা বলল, কে জানে। ওসব লক্ষ্মীদি আর বন্দনাদি ঠিক করবে।

আগের বার আমাকে আবৃত্তি করতে দিয়েছিল, এবার কিচ্ছু বলেনি।

এখনও তো দেরি আছে বাবা।

বন্দনাদি কাছে এসে বলল, স্টেপিংটা আর একটু মেপে করিস। যত বড় সারকেলে ঘুরছিলি স্টেজে তো অত বড় জায়গা পাবি না। মনে মনে একটা মেজারমেন্ট করে তার মধ্যে থাকবি।

তাল কাটেনি তো বন্দনাদি!

না না, ওসব ঠিক আছে।

ফেরার সময় জ্যোৎস্নারাতে তারা চারজন গল্প করতে করতে ফিরছিল। কথার চেয়ে তাদের হাসিই বেশি।

হঠাৎ একটা বাঁশির গম্ভীর, বুকে হাহাকার তোলা শব্দ চারদিক তোলপাড় করে বেজে উঠল। প্রথমে শঙ্খের মতো নাদ, তারপর বিষাদবপন। মালকোষ। একটু থেমে গিয়েছিল নীপা। তারপর তার পদক্ষেপ একটু স্খলিত হয়ে গেল।

শিবানী করুণ গলায় বলে, ওর কেউ নেই, জানিস! সবাই মরে গেছে।

করুণাও মাথা নেড়ে বলে, ইস রে! একদম একা। বউটা পর্যন্ত চলে গেছে। কেন যে মেম বিয়ে করতে গিয়েছিল কে জানে বাবা!

শুধু শান্তিরই একটু রাগ। বলল, ফের ভুতুড়ে বাঁশিটা বাজাচ্ছে দেখ! এখন যদি আস্তিকগুলো গর্ত থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসে, কী হবে বল তো!

নীপা কিছু বলছে না। বলার মতো অবস্থাই তার নয়। তার শরীরে ফের মৃদঙ্গের মতো কাঁপন। শরীর দুলতে চাইছে। ঘোর লাগছে চোখে।

বাবা অনেক রাতে ফেরে। তার জন্য জেগে বসে থাকে নীপা। বাবা

BanglaBook.org

ফিরলে একটু খুনসুটি হয়। তারপর ঘুমোতে যায় ঠাকুমার কাছে। তবে দোতলায় তার একটা আলাদা একটেরে ঘর আছে।

সে মাকে বলল, মা, আজ আমি দোতলায় শুই?

শুবি! একা ভয় পাবি না? তোর তো ভূতের ভয়।

শুই না মা।

তাহলে পটলিকে নিয়ে যা। বস্তা পেতে মেঝেয় শুয়ে থাকবেখন।

পটলিকে নেওয়া না-নেওয়া সমান। ও পাথরের মতো ঘুমোয়, গায়ে মোষ ছেড়ে দিলেও ঘুম ভাঙবে না।

তবু শুক, একটা জন তো।

বাড়ি আসার পর থেকে মোবাইলটা একরকম বন্ধই রাখে নীপা। কলকাতাতেও বন্ধই রাখতে হত। আজেবাজে কল আসে, মেসেজ আসে। আজ মোবাইল খুলে দেখল, বিরক্তিকর আর একটি মেসেজ, ইউ আর মিসিং! হোয়ার আর ইউ? কল মি টুনাইট।

ফোরামে একটা ছেলে গায়ে পড়ে আলাপ করেছিল। তার নাম সমুদ্র রায়। বড্ড ছোঁক ছোঁক করে লেগে আছে পিছনে সেই থেকে। মেসেজটা ডিলিট করে দিল সে। পরীক্ষার পর তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অনেকেই দূরে বেড়াতে গেছে। কুলুমানালি, দেরাদুন, মুম্বই, সিকিম, তাদের ফোন করলে বেচারাদের রোমিং চার্জ উঠবে। তাই এক-আধটা মেসেজ করেই ক্ষান্ত থাকতে হয়। মোবাইলটা এখন সারা দিন একরকম বোবা।

ওপরের ঘরে এসে পটলি তার দীন বিছানাটি করে নিয়ে 'দিদি শুই' বলে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

নীপা আলমারি থেকে দূরবিনটা বের করে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু শীত করছে। এ সময়ে এখানে বেশ হিম পড়ে।

দূরবিনটা ধীরে ধীরে ফোকাসে এনে সে রায়বাড়ির দোতলার একটি ঘরে খোলা জানালার দিকে তাকাল। ভিতরে আলো জ্বলছে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে সাদা পায়জামা আর গায়ে ফতুয়া পরা একজন সুন্দর পুরুষ। মাথাভরতি কোঁকড়া চুল। খুব ফরসা নয়, আবার কালোও নয়। পুরুষের রূপ নিয়ে মেয়েদের তেমন মাথাব্যথা নেই। সেটা বড় কথাও

BanglaBook.org

নয়। কিন্তু এই পুরুষটিকে নিয়ে পিছিয়ে থাকা গাঁয়ে একটু একটু মিথ তৈরি হচ্ছে। রহস্যময়তা।

খুব মন দিয়ে দেখছিল নীপা। মৃদুল একটা বই পড়ছে। খুব মন দিয়ে পড়ছে। একজন একা লোক। হয়তো দুঃখী লোক। যার কেউ নেই তার জন্য একটু মায়া তো হতেই পারে। তার হচ্ছে।

ঘুমোও বাঁশিওয়ালা, ঘুমোও। বাঁশিতে কার কাছে কোন খবর পাঠাও তুমি? কাকে ডাকো? কেউ কি ফিরে আসবে বিরহান্তর থেকে?

একটু শিউরে উঠল নীপা। রায়বাড়ির ছাদে রেলিঙে ভর দিয়ে ও কে দাঁড়িয়ে আছে? পরি! নাকি অন্য কিছু?

মা গো!

না, চোখের ভুল। কিছু নেই। মাটির ভাপ আর শিশির মিলে একটা ধোঁয়াটে বিভ্রম সৃষ্টি করে এ সময়ে। সাদা মূর্তিটা আর নেই তো ওখানে। একটু ওপরে উঠে যেন ভেসে আছে মেঘখণ্ডের মতো।

চোখে একটু জল এল। আর চোখের কোলে জলটুকু নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল নীপা।

কমল বিশ্বাস ওর বাড়িটা কিনে নিচ্ছে, জানিস! লোকটা এবার যাবে। গেলে বাঁচি বাবা।

কেন রে! ওরকম করে বলতে আছে?

তুই জানিস না, কালও জঙ্গলপাড়ায় সাপ বেরিয়েছিল। তুই বিশ্বাস করিস না, কিন্তু সত্যিই ওই লোকটা বাঁশি বাজালেই সাপ বেরোয়।

বাড়ি বিক্রির খবর তোকে কে দিল?

সবাই জানে। দশ লাখ টাকায় বাড়ি, বাগান, পুকুর। দশ লাখ টাকা অনেক টাকা, না রে?

নীপা আনমনে শুধু একটা হুঁ দিল। পেয়ারাতলার চকচকে মাটিতে আলতো পায়ে পায়চারি করতে করতে ও কেবল ভাবতে লাগল।

কমল বিশ্বাস বাড়িটা কিনলে খুব ভাল হবে। কেন জানিস? ওদের

BanglaBook.org

অনেক লোক। বাড়িটা জমজম করবে। খালি ভুতুড়ে বাড়িটা দেখলে যা ভয় ভয় করে আমার!

শুনেছি মৃদুলদা জমি-বাড়ি বিক্রি করতেই এসেছিল।

লোকটার একদম হিসেবি বুদ্ধি নেই কিন্তু। বাবা তো বলছিল, ওই সম্পত্তিটার দাম কুড়ি লাখ টাকার কাছাকাছি হতে পারত। বাড়িটায় কত জিনিস আছে বল। আমার দাদা তো বলে ও বাড়িতে গুপ্তধনও আছে। লক্ষ্মীদি সেদিন দুঃখ করে বন্দনাদির কাছে গল্প করছিল, আমি শুনেছি। বাড়িটাতে নাকি খুব দামি কাঠের দশ-বারোটা আলমারি, লোহার সিন্দুক, প্রায় পনেরো-ষোলোটা খাট আর পালঙ্ক, রুপো আর কাঁসার বাসনপত্র, আরও কত কী আছে। সেগুলোর দামই নাকি কয়েক লাখ টাকা।

নীপা বিরক্ত হয়ে বলল, ভ্যাট, কেবল টাকাপয়সার হিসেব শোনাচ্ছিস কেন? যার জিনিস সে যদি উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয় তো কার কী? সকলেই বুঝি হিসেবি হবে?

না, এমনি বলছিলাম আর কী! লোকটা বোকা তো, তাই।

বোকারাই ভাল। বেশি চালাকের গলায় দড়ি।

ওর মেম-বউটা নাকি ভীষণ খান্ডার ছিল, টাকাপয়সা সব শুষে নিয়েছে।

তাতেই বা আমাদের কী?

না, এই বলছিলাম আর কী।

অন্য কথা বল। তুই না কমপিউটার শিখতে চেয়েছিলি! এখন শিখবি?

শান্তির মুখ উজ্জ্বল হল। চেয়ার ছেড়ে টক করে দাঁড়িয়ে বলল, শেখাবি? চল তাহলে! একটু গেম খেলি চল।

গেম খেললে কিন্তু আর কমপিউটার শেখা হবে না।

আচ্ছা, একটু শিখব, একটু গেমও খেলব। রাজি?

বিলোচনের অফিসঘরটা বাইরের দিকে। সদর ফটকের কাছে। নামেই অফিসঘর, ব্যস্ত বিলোচন কদাচিৎ এই অফিস ব্যবহার করে। শখ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। বিলোচনের বেশির ভাগ সময় কাটে

BanglaBook.org

খেত-খামার এবং দুটো কোল্ড স্টোরেজে। আলু রুইবার জন্য এখন খেতের প্রস্তুতি চলছে।

দু'জনে পাশাপাশি বসে নিবিষ্ট হয়ে কমপিউটারের ছলাকলা অবলোকন করছে। মনিটরে কারসারটাকে বাগে আনতে পারছিল না শান্তি। ধৈর্য হারিয়ে বলল, দুর, তিরটাকে জায়গামতো লাগাতে পারছি না কেন বল তো!

প্রথম প্রথম ওরকম তো হবেই। তড়বড় করিস না, হাতটাকে নরম করে আলতোভাবে ধর, তারপর অল্প একটু মুভ করবি। তুই বেশি মুভ করে ফেলছিস।

কমপিউটারের নিজস্ব সম্মোহন আছে। সে ধীরে ধীরে মানুষকে তার আশ্চর্য অভ্যন্তরে টেনে নিতে পারে। একটু বাদেই শান্তির চক্ষুর তারা স্থির হল। সে একটু একটু করে ফ্রেম থেকে ফ্রেমে ঢুকে যেতে লাগল। মুখে শব্দহীন খুশিয়াল হাসি ঝুলে আছে।

বাইরে কে যেন কাকে অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করল, কাকে খুঁজছেন?

ভারী নরম আর ভিতু একটা গলা বলল, ঠাকুমা আছেন?

হ্যাঁ, ভিতরে। কিন্তু আপনি—

আসলে উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ও, তাহলে ভিতরে চলে যান। ডানদিকের শেষ ঘর।

এ বাড়িতে সারা দিন হরেক লোকের যাতায়াত। কৌতূহলের বিষয় নয়। তবু আলগোছে বাইরে দৃকপাত করে অবাক হয়ে গেল নীপা। মৃদুলদা!

তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় এসে বলল, ঠাকুমার কাছে যাবেন?

মৃদুলের ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুলের ওপর একটা সবুজ পেয়ারাপাতা আটকে আছে। চোখেমুখে একটু লজ্জা সংকোচ আর অপ্রতিভ ভাব। তাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, সুধাপানি ঠাকুমা।

আশ্চর্যের বিষয়, সম্পূর্ণ অচেনা লোক দেখেও বিমোহন একবারও ডাকেনি। তার স্বভাব অচেনা দেখলেই তেড়ে যাওয়া। বরং সে

BanglaBook.org

লোকটার সামনে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে হ্যা-হ্যা করতে করতে লেজ নাড়ছে। ভারী আপ্যায়নের ভাবভঙ্গি।

আসুন আমার সঙ্গে।

সাদা পায়জামা আর কোঁচকানো বোতাম-ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরা লোকটা বশংবদ ভঙ্গিতে পিছু পিছু এল।

ঠাকুমা, মৃদুলদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

সুধাপানি দু'গাল ভরে হাসলেন, এসেছিস! ডেকে পাঠাতে হয় কেন রে ছোঁড়া? নিজে থেকে আসতে পারিসনি! আগে তো ঝাঁকের সঙ্গে কত এসেছিস পুজোর পেসাদ খেতে আর আম পেয়ারা চুরি করতে। বোস ওই চেয়ারটায়, তোকে একটু ভাল করে দেখি! ওমা, তুই দাঁড়িয়ে কেন রে ছুঁড়ি? আয়, পাশে বোস এসে। এই দ্যাখ মৃদুল, আমার ছোট নাতনি নীপা, নীপবতী।

নীপবতী নয় ঠাকুমা, নীপবীথি।

পোশাকি নাম আমার মনে থাকে না বাবা। নীপাই ভাল। তা হ্যাঁ রে মৃদুল, আমাকে তোর মনে আছে?

আছে। কিন্তু আমাকে কেউ চিনতে পারছে না। খুব ছোট ছিলাম তো। তবে আমার দাদাকে কেউ ভোলেনি।

প্রতুল! আহা, অল্প বয়সে চলে গেল! তা সব বেচেবুচে নাকি গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিচ্ছিস! বাস্তুভিটেটুকু রাখতে পারতিস তো!

রাখতে কি পারা যাবে? যতদিন হরপ্রসন্নজ্যাঠা আর লক্ষ্মীদি আছেন, তারপর কী হবে কে জানে!

খবর পেয়ে ধেয়েপেয়ে শশীমুখীও এলেন, ওমা, তুমি এসেছ! একদিন তোমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব বলে ঠিক করেই রেখেছি। কবে খাবে বলো!

কয়েকদিন আছি। আবার নেমন্তন্ন কেন করবেন? একদিন হুট করে এসে খেয়ে যাব।

তাই কি হয়! বড় লজ্জায় পড়েছিলাম সেদিন। আমাদের বেড়ালটা গিয়ে তোমার মাছ চুরি করে খেয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

দুর! তাতে কী? বেড়ালরা ওরকম কত করে। তবে তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যায়।

নীপা অপলক চেয়েছিল, আপনি কি পশুপাখি পোষ মানাতে জানেন?

মৃদুল লাজুক হেসে বলে, না তো!

তবে বিমোহন আপনাকে দেখে তেড়ে গেল না কেন? ওটা সড়ালে কুকুর। ভীষণ তেজি।

কেন তেড়ে যায়নি তা জানি না। তবে তোমাদের কুকুরটা যখন মুখ তুলে আমার দিকে চাইল তখন আমি দূর থেকেই তাকে হাতজোড় করে বলেছিলাম, নমস্কার, আপনি কি আমাকে এ বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেবেন? দেখলাম কুকুরটা বেশ খুশি হল, ল্যাজ নাড়তে লাগল।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীপা খুব হাসল, বলল, যাঃ, বাজে কথা!

শশীমুখীও হাসছিলেন। বললেন, বাজে কথা হবে কেন? বিমোহন আমার অনেক কথা কিন্তু বুঝতে পারে বাপু। কেমন বসে বসে বড়ি পাহারা দেয়, পুকুরধারে চটিজোড়া ফেলে এসেছিলাম, বলতেই মুখে করে এনে দিল, পালবাড়ির ছেলেটা তো জলে ডুবে মরেই যেত, ওর চেঁচামেচিতেই তো লোক জড়ো হয়ে ছেলেটা বাঁচল।

নীপা বলে, কিন্তু কখনও কোনও নতুন লোককে সহজে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি।

শশীমুখী স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, এটা নতুন। বোধহয় ভালমানুষ বলে চিনতে পেরেছে। কুকুর-বেড়ালরা কিন্তু ভাল লোক আর পাজি লোক খুব চেনে বাবা। হ্যাঁ বাবা মৃদুল, আজ চিতল মাছ রান্না হয়েছে, এখানেই দুপুরে দুটি খেয়ে যাও না বাবা।

তাহলে লক্ষ্মীদি রাগ করবে। ও বাড়িতেও আয়োজন হয়েছে তো!

তাহলে আমি আজ নীপাকে দিয়ে তোমার জন্য মাছ পাঠিয়ে দেব।

না না। আমি অত পেটুক নই।

বারণ শুনব না কিন্তু।

সুধাপানি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এবার বললেন, হ্যাঁ রে,

BanglaBook.org

সাহেবদের দেশে গিয়ে গোরু-মোষ খাস নাকি?

মৃদুল মৃদু লাজুক হাসি হেসে বলে, সেসব আপনার শুনে দরকার নেই।

গোবর গঙ্গাজলে গুলে এক ঢোঁক খেয়ে নিস, তাহলেই সারবে।

লাভ কী? ফের যদি ম্লেচ্ছ দেশেই যেতে হয় তাহলে আবার তো ওসবই খেতে হবে।

পড়েই বা আছিস কেন ওখানে? গোবিন্দ রায় যে রাজ্যপাট রেখে গেছে তাতেই তো ঢলাঢলি।

হঠাৎ একটু মেদুর হয়ে গেল মৃদুল, হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক। ফিরে যাওয়ার কোনও জোরালো কারণও আমার নেই।

ও বাড়ি বেহাত হয়ে গেলে তোর জ্যাঠার আত্মা খুব কষ্ট পাবে।

মৃদুল আর হাসছে না। তার মুখের প্রতিটি রেখার পরিবর্তন, প্রতিটি কুঞ্চন, আলোকিত ও ছায়াময় ভাষা অপলক চোখে দেখছিল নীপা। নিজের হার্টবিট শুনতে পাচ্ছে সে। ডুবডাব, ডুবডাব।

ফেরার সময় গাছগাছালিতে ছাওয়া বনপথটিতে মৃদুলকে অনেকটা এগিয়ে দিল নীপা।

আমি শুধু ভাবছি, বিমোহন আপনাকে দেখে একটুও শব্দ করল না কেন! খুব অবাক কাণ্ড!

মিষ্টি একটু হেসে মৃদুল বলে, দুঃখী মানুষকে দেখে সকলেরই দয়া হয়।

মোটেই না। আমাদের বাড়িতে নতুন ভিখিরি এলে বিমোহন ছাড়ে নাকি! তেড়ে গিয়ে লন্ডভন্ড কাণ্ড করে। ভিখিরিরা কি দুঃখী নয়?

তাহলে বোধহয় বোকা এবং নিরীহ বলে বুঝতে পেরেছে।

আমাদের বাড়িতে সবরকম মানুষ আসে। বোকা আর নিরীহ হলে আমার মেসোমশাইয়ের ধুতি টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল কেন বলুন!

তাহলে বোধহয় কোনও চেনা লোকের আদল দেখতে পেয়েছে আমার মধ্যে।

ঠাট্টা করবেন না। আমি কিন্তু ভীষণ অবাক হয়েছি। কুকুরেরা চেনা

BanglaBook.org

লোককে চেনে গন্ধ দিয়ে, চেহারা দিয়ে নয়।

কী জানি। আমি কখনও কুকুর পুষিনি। কুকুররা কেমন হয় তা তো জানি না।

সেটাই তো আরও আশ্চর্যের ব্যাপার। আমার একটা বোকাসোকা বন্ধু আছে, সে আপনাকে খুব ভয় পায়।

সে কী! আমাকে ভয় পায় কেন?

আপনি যে সব উড়ন্ত ঘুড়ি কেটে দেন তাতেই ওর ধারণা হয়েছে আপনি মন্ত্র জানেন।

খুব হোঃ হোঃ হাসল মৃদুল। বলল, দাদা আমাকে মাঞ্জা দিতে শিখিয়েছিল, ঘুড়ি ওড়ানোর কায়দাও। সব ভুলে গিয়েছিলাম। এখানে এসে একটু একটু করে মনে পড়ল।

ওর ধারণা আপনি বাঁশি বাজালে গর্ত থেকে সাপেরা বেরিয়ে আসে।

যাঃ, সাপ কি শব্দ শুনতে পায়? কানই নেই।

সেটা ওকে বলেছি, কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

তুমি সেরকম কিছু ভাবো না তো!

না। কিন্তু কাল যখন রাতে আমরা রিহার্সাল থেকে ফিরছিলাম, তখন আপনি বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। মালকোষ, আমার কেমন ঘোর ঘোর লাগছিল। হাঁটতে গিয়ে স্টেপিং গণ্ডগোল হচ্ছিল।

বাঁশি এক আশ্চর্য জিনিস।

ও দেশেও বাজাতেন?

মাথা নেড়ে মৃদুল বলে, না। সময় কোথায়? সব ভুলে গিয়েছিলাম। এখানে এসে একটু একটু করে মনে পড়ে গেল। আমরা তিন পুরুষের বাঁশুরে। দাদু বাজাতেন, বাবা-জ্যাঠা-নগেনকাকা বাজাতেন, দাদা বাজাত। আমি কিন্তু তত ভাল বাজাই না। এখানে এসে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে অনেকগুলো বাঁশি পেয়ে লোভ সামলাতে পারিনি। কে জানে বাঁশিতে হয়তো জ্যাঠামশাই ভর করেন।

আপনি ওসব বিশ্বাস করেন?

আরে না। ঠাট্টা করলাম।

BanglaBook.org

আচ্ছা, আপনার তো এখন কেউ নেই, না?

মৃদুল মাথা নেড়ে বলল, না কেউ নেই। বাবা, মা, নগেনকাকা কবেই মরে গেছে, জ্যাঠামশাইও চলে গেলেন, দাদা ছিল, নেই হয়ে গেল এক লহমার একটা রোড অ্যাকসিডেন্টে। একটা মেয়ে আছে আমার, জানো বোধহয়। তবে তার সঙ্গে আমার কোনওদিনই আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হলেও কেউ কাউকে চিনতে পারব না। চিনেও লাভ নেই, সে হবে এক গ্রহের লোক, আমি অন্য গ্রহের। হয়তো মুখের আদল আর ডি এন এ-র মিলটুকু থাকবে, আর কিছু নয়। আমি মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারিনি।

ওভাবে বলছেন কেন?

আরে, তোমার চোখ ছলছল করছে নাকি? ভারী সেন্টিমেন্টাল মেয়ে তো তুমি! এরকম তো হয়ই।

হওয়া উচিত নয়। এরকম হওয়া উচিত নয়।

সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে মৃদুল বলল, হ্যাঁ। একা হওয়া, একা হতে বাধ্য হওয়া উচিত নয়।

তবে হলেন কেন?

স্বগতোক্তির মতো সুরে মৃদুল বলে, ইচ্ছে করে কি হতে গেলাম পাগল? কেউ কি তা চায়?

আপনি আপনার স্ত্রীর কথা তো বললেন না!

বলার কিছু নেই। আমি একরকম, সে অন্যরকম। তার কোনও দোষও ধরা যায় না। সে তো আমাদের মতো নয়। দুটো শব্দ আছে, জানো! রমণীয় আর পরম। ওদের কাছে জীবন হল রমণীয়, আমাদের কাছে পরম। তফাতটা হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারব না।

আমি বুঝি বাংলা জানি না!

লজ্জা পেয়ে মৃদুল বলে, না না, আমি তা বলিনি। আসলে কথাটা হয়তো একটু বাণীর মতো শোনাল।

ওই দেখুন, আপনার জানালায় চন্দ্রমণি বসে আছে! কী বিচ্ছু বেড়াল! ও কি আপনার জন্য বসে আছে নাকি?

BanglaBook.org

বোধহয়। আমাদের মধ্যে আজকাল বেশ ভাবসাব।

তাই দেখছি। চন্দ্রমণি আপনার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে, বিমোহন আপনাকে ভাল চোখে দেখে। কী যে হচ্ছে এসব!

মৃদুল একটু হাসল, বলল, তুমি একটু দুষ্টু, না?

ক'টার সময়ে ভাত খাবেন বলুন তো!

একটা-দেড়টা হবে বোধহয়।

দেরি আছে। আমি ঠিক সময়ে আপনার মাছ পৌঁছে দিয়ে যাব।

কেন যে কষ্ট করবে!

কারও কারও জন্য কষ্ট করলে পুণ্য হয়। ও আপনি বুঝবেন না।

ফিরে এসে দেখল অফিসঘরে কমপিউটারের সামনে কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে শান্তি। সে ঘরে ঢুকতেই বলল, কোথায় গিয়েছিলি তুই? দেখ তো, সব গণ্ডগোল করে বসে আছি! ছবি নড়ছেও না চড়ছেও না।

নীপা দেখে বলল, ও তো হ্যাং করে গেছে। সরে বোস, দেখছি।

শান্তি সরে বসে বলল, কতক্ষণ ধরে তোর জন্য বসে আছি! ভাবছি আমার দোষেই তোর কমপিউটারটা খারাপ হয়ে গেল কি না।

না রে, না। যন্ত্র মানেই প্রবলেম।

কোথায় গিয়েছিলি বললি না?

মৃদুলদা এসেছিল, গল্পটল্প হচ্ছিল।

চোখ কপালে তুলে শান্তি বলল, মৃদুল রায়! ওই সাংঘাতিক লোকটা! ওরে বাবা, আমার বুক ধকধক করছে।

দুর পাগলি! তুই একটা গেঁয়ো ভূত!

তোর বাবা বড্ড সাহস। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে আমারও সাহস হত। কী করব বল, পড়েছি গাঁয়ের এঁদো স্কুলে।

চল, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। তাহলেই দেখবি তোর ধারণা পালটে যাবে।

ও বাবা, সে আমি পারব না।

খুব পারবি। একটু পরেই আমি যাব ওবাড়িতে। তুইও সঙ্গে যাবি।

BanglaBook.org

শান্তি হেসে ফেলল, দেখতে খুব সুন্দর, না?

পছন্দ বুঝি?

ধ্যাত। আমার পছন্দ হলেই কি, না হলেই কি বল। কেউ তো আর আমাকে পছন্দ করবে না।

কেন রে! খেঁদি-পেঁচিরাও প্রেম করছে, বিয়ে বসছে, তুই ফেলনা কীসের? দিব্যি তো ঢলঢলে চেহারা। আমার চেয়ে তুই ঢের সুন্দর।

শান্তি অবাক হয়ে বলে, তোর পাশে আমি! আর হাসাস না।

নিজের সম্পর্কে তোর ধারণাই নেই। ঠিক দেখিস, তোর পঞ্জাবেই বিয়ে হবে। দাড়ি পাগড়িওয়ালা পেল্লায় বর পাবি।

আট

এই সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে প্রতুল নামছিল, পিছনে সে। দাদা তার চেয়ে বারো বছরের বড় ছিল। তার তখন পাঁচ-ছয়, দাদার সতেরো-আঠারো। যেখানে দাদা সেখানে সে। সব সময় দাদার গায়ে গায়ে লেগে থাকা হয়তো দাদা তেমন পছন্দ করত না। কখনও-সখনও ধমক দিত, যা না বন্ধুদের সঙ্গে খেল গে যা। সে যেত না। একদিন দাদা তার সামনেই ছাদে বসে একটা আস্ত সিগারেট প্রথম থেকে শেষ অবধি খেয়ে শেষ করে শানে আগুনটা পিষে নিবিয়ে দিয়ে নেমে এল, পিছে সে। দৃশ্যটা, তুচ্ছ দৃশ্যটা কেন যে মনে আছে! হ্যাঁ, সে খুব অবাক হয়েছিল ঠিকই। এ বাড়িতে কস্মিনকালেও কেউ সিগারেট খায়নি। দাদা শুধু বলেছিল, কাউকে বলিস না যেন হাঁদা কোথাকার! সে বলেনি। দাদার কোনও কথাই সে কাউকে বলে দেয়নি কখনও। এমনকী নিকুদিকে চুমু খাওয়ার কথাও নয়। আকণ্ঠ আনুগত্য ছিল তার দাদার প্রতি।

সিঁড়ি দিয়ে দাদা নামছে, সে পিছনে। আর নীচের উঠোনে পাড়ার মেয়েরা। এ বাড়ির মেয়েরা এক দঙ্গল গোল্লাছুট খেলছিল। এইটুকু মনে পড়ে। আর কিছু নয়। পরদিন পোড়া সিগারেটটা তার বাবা ছাদে কুড়িয়ে

BanglaBook.org

পায়। কে খেয়েছে সিগারেট! বাড়িতে হইহই কাণ্ড। সে বলেনি।

বেঁচে থাকলে, রুকুর বয়স হয়তো সাতাশ-আঠাশ হত এতদিনে। কবে তাকে পছন্দ করে বেছে রেখেছিল মা তার জন্য কে জানে! রুকুকে কিছুতেই মনে আনা যাচ্ছে না।

আজ সন্ধেবেলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার ওপর স্মৃতির এইসব তুচ্ছ বৃষ্টিপাত হয়ে যাচ্ছিল। স্মৃতি এক মেঘলা আকাশ। কত কী ঢেকে আছে। ছেলেবেলায় সে দেখেছে এ বাড়ি ভরতি লোক, সরগরম। দরদালানে লম্বা সারি দিয়ে পাত পড়ত। যারা ছিল তারা সকলেই এই বংশোদ্ভূত নয়। বেশির ভাগই আশ্রিত, জ্ঞাতি, লতায়-পাতায় আত্মীয়। যেমন তার দাদুর এক খুড়তুতো ভাই ছিল অশ্বিনী। ছানাপোনা নিয়ে থাকত। কোন সুবাদে ছিল কে জানে। হয়তো নিষ্কর্মা, অসহায়। তার বউ খুব ঝগড়া করত এটা মনে পড়ে। ছিল বিপুলকান্তি নামে একজন গায়ক। সেও কীরকম আত্মীয় যেন। কোলে হারমোনিয়াম নিয়ে রাগাশ্রয়ী গান গাইত খুব, রেডিওতে তার গান হয়েছিল একবার। আর গ্রামে তাকে নিয়ে কী হইচই।

ছাদ থেকে দোতলায় নেমে এল সে।

সন্ধে হয়ে আসছে। এই সন্ধিসময়ে তার মন বড় খারাপ থাকে। শহরে এই বিষণ্ণ বিকেলটা টের পাওয়া যায় না তেমন। এখানে দিনের রাত হয়ে যাওয়া বড় বেশি শ্বাস চেপে ধরে।

উঠোনে তুলসীতলা আছে, তুলসী গাছও রয়েছে। প্রদীপ জ্বালানোর পাট আর নেই। ওই তুলসীতলায় ঠাকুমার মৃতদেহ শয়ান দেখেছিল সে। সেই প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার।

মনে পড়ছে। মনে পড়ছে। একটু একটু করে চুঁইয়ে আসছে স্মৃতির জল।

ছাদে গিয়েছিলে বুঝি?

মেদুর চোখে ঘোরলাগা অপ্রত্যয়ে সে শুধু বলল, হ্যাঁ। ছাদে।

আর কিছু বলতে পারল না লক্ষ্মীদিকে।

কাজের মেয়েটাকে নিয়ে ঘরদোর সাফ করাতে ওপরে এসেছিল

BanglaBook.org

লক্ষ্মীদি। চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মৃদুল ডাকল, লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মী ঘুরে তাকাল, কিছু বলবে? চা চাই?

না, চা খেয়েছি।

আজ বেরোলে না?

বেরোব।

বলো।

এ বাড়ির প্রতি আপনার এত মোহ কেন?

লক্ষ্মী হাসল, মোহ! মোহ কথাটা বড্ড ভারী। একটু মায়া আছে।

কেন লক্ষ্মীদি?

এমনি। এর কোনও মানে নেই।

আছে। আজ মৃদুল আন্দাজ করতে পারে। আছে।

তার হ্যান্ডসাম এবং ব্রিলিয়ান্ট দাদা প্রতুলকে নিয়ে কথা হত প্রায়ই। সে কথাগুলো খুব ফিসফাস করে হত। তবু কানে আসত তার। গাঁয়ের মেয়েরা জ্বালাতন করে খেত দাদাকে। বয়ঃসন্ধির মেয়ে সব, এমনকী জ্ঞাতি বোনেরাও। দাদা হেঁটে গেলে দু'ধার থেকে মুগ্ধ চোখ এসে পড়ত। দাদার সঙ্গে সেঁটে থাকা মৃদুল, সেই অপরিণত বয়সেও টের পেত সেটা।

পনেরো-ষোলো বছর আগে দাদা একবার দেশের বাড়িতে এসেছিল। তখনও বিয়ে হয়নি দাদার। এইটুকু সে জানে। বাকিটুকু জানে না। কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় অদৃশ্য দাদার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে সে একটা কিছু টের পাচ্ছিল। একটা ডিডাকশন। অন্ধকারে ঢিল।

পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল মৃদুল। ভারী আনমনা। ভারী বিষাদে ভারাক্রান্ত তার মন। একটা জাল অতীতকে আবছা করে রেখেছে। ছেঁড়া যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে আজও সে অনেক দূরে চলে গেল। তার পর এ ধার ও ধার ঘুরে সে অজান্তেই চলে এল রুকুদের বাড়ির পিছনে, অন্ধগলিতে। এ পথ দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। তাই লোক চলাচল নেই।

BanglaBook.org

অন্ধকারে সে রুকুদের ভাঙা পোড়ো বাড়ির দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। এ কোনও প্রেমের উপাখ্যান তো নয়। শুধু একটা মুমূর্ষু মেয়ের উৎসুক আকাঙ্ক্ষা, তাকে ঘিরে। বেঁচে থাকলেও হয়তো রুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হত না। কিংবা হত। কে জানে।

তোমাকে আমার মনে নেই রুকু। ক্ষমা করে দিয়ো।

যখন চলে আসছে তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভব হল তার। পিছনে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে? দেখছে তাকে?

সে ঘুরে দাঁড়াল। ফের বলল, তোমাকে মনে নেই, মনে নেই। কোনও ছায়া নেই, ছবিও নেই।

যখন ফিরল তখন দীননাথ বসে আছে উঠোনের চেয়ারে।

কোথায় গিয়েছিলি অন্ধকারে?

অন্ধকার কোথায়! চাঁদ আছে তো।

তবু টর্চ নিতে হয়। সাপ বেরোচ্ছে প্রায়ই।

এ গাঁয়ে কি খুব সাপ?

আগে তো ছিল না। আজকাল বাড়িঘর উঠছে, জঙ্গল কাটা পড়ছে। তাই একটা দুটো-বেরোয়। জানোয়ারদের হ্যাবিট্যাট বলে তো কিছু আর থাকছে না। সব জায়গা দখল করে নিচ্ছে মানুষ। কোথায় যে যাবে ওরা!

মুখোমুখি চেয়ারে মৃদুল বসল। কপালে ভাবনার কুঞ্চন।

তোর যাওয়ার কি ঠিক হয়ে গেছে?

কোথায় আর হল। কমল বিশ্বাস নামে একজন দশ লাখ টাকা হেঁকে গেছে। কিন্তু এখনও কিছু ঠিক করিনি।

কমলের কথা জানি। যদি ধরে রাখতে পারিস তা হলে দাম বাড়বে। কিন্তু তোর তো অত সময় নেই।

মৃদু একটা হুঁ দিয়ে চুপ করে গেল মৃদুল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, ভাগীদারও তো অনেক।

দু'জন। তবে নগেন রায়ের স্ত্রী বুড়ো হয়েছেন। তিনি আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আর—

বাধা দিয়ে মৃদুল বলে, ওসব কথা থাক দীনুদা। বিষয়-সম্পত্তি ছাড়াও

BanglaBook.org

অনেক প্রশ্ন আছে। আজ তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাইব।

বল না।

এখানে নয়, আমার ঘরে চলো।

দু'জনে ওপরে উঠে এল। বসবার পর মৃদুল বিনা ভূমিকায় হঠাৎ সরাসরি জিজ্ঞেস করল, তুমি লক্ষ্মীদিকে বিয়ে করলে না কেন দীনুদা?

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত। অস্বস্তিকর। দীনু একটু থতমত খেয়ে গেল।

মৃদুল বলল, এ তো গোপন কথা নয়, সবাই জানে।

দীনু মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

কেন বিয়েটা হল না তোমাদের?

দীনু একটু হেসে বলে, সব কি মানুষের ইচ্ছেয় হয়! কিছু ঘটনার লাগাম আমাদের হাতে থাকে, কিছু ঘটনা অন্য কেউ ঘটায়।

আমি বুঝতে চাই দীনুদা।

বুঝবি না। কথায় যদি সব কিছু প্রকাশ করা যেত।

আজ সন্ধেবেলার মুখটায় ছাদ থেকে নামছিলাম। অনেক দিন আগেকার একটা অর্থহীন ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। যেন দেখতে পেলাম আমার দাদা আগে আগে নামছে।

প্রতুলকে বড্ড ভালবাসতিস তুই। সব সময়ে প্রতুলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতি।

দাদাও খুব ভালবাসত আমাকে। জোর করে আমাকে ওদেশে নিয়ে গেল। বলেছিল, আয়, দু' ভাই একসঙ্গে থাকব। কথাটা ঠিক, সব ঘটনারই লাগাম আমাদের হাতে থাকে না। একসঙ্গে থাকা আর হল না। তবু যতদিন বেঁচে ছিল আমাকে সাহায্য করত। বউদিকে লুকিয়ে টাকাপয়সা দিত, জিনিস কিনে দিত। কিন্তু দাদার কথা আজ আমার অন্য কারণে মনে পড়ল। দাদার একটা দোষ ছিল। নারীঘটিত।

দীননাথ চুপ করে রইল।

আজ আমি লক্ষ্মীদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ বাড়ির প্রতি তাঁর এত মোহ কেন? এ বাড়ির প্রতি তাঁর এত টান কীসের জন্য। লক্ষ্মীদি আবছা জবাব দিল। সেবা আমাকে বলেছে, লক্ষ্মীদি মাছ-মাংস খায় না, বিধবার

BanglaBook.org

মতো থাকে। এসব মেলাতে গিয়ে একটা রূঢ় সত্য হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দীনুদা, সত্যি করে বলবে, লক্ষ্মীদির ছেলের বাবা কি আমার দাদা প্রতুল?

দীনু একটু চুপ করে তার দিকে চেয়ে রইল। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি-মিথ্যে জানি না রে। লক্ষ্মী আমাকে কখনও বলেনি। মেরে ফেললেও ওর মুখ থেকে সত্যিটা বের করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তবে প্রদ্যুম্নর চেহারায় এই বংশের ছাপ আছে।

নীরবে মাথা নাড়ল মৃদুল। তার পর খুব অন্যমনস্কভাবে বলল, আইনের কথা জানি না, কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত এইসব বিষয়-সম্পত্তির একজন অংশীদার তো প্রদ্যুম্নও। তাই না?

বিষয়-সম্পত্তির কথা ছেড়ে দে। হরজ্যাঠার বিষয়-সম্পত্তি কিছু কম নেই। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে ভেজাল বাড়ানো আর ঠিক হবে না। কিছু বিষয় আছে যেখানে চোখ বুজে থাকতে হয়।

আমি দু'দিন ধরে খুব ভাবলাম দীনুদা। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় বেচে আমি পালাতে পারি বটে, কিন্তু সেটা আমি করব না। বিক্রি করলে ন্যায্য ভাগ দেব। আর যদি বিক্রি না করি—

দীননাথ মাথা নেড়ে বলে, তাহলে রক্ষা করা যাবে না। বেহাত হয়ে যাবে। তুই চলে যাবি, হরজ্যাঠাও চিরদিন থাকবে না, লক্ষ্মীর বয়স হয়ে যাবে। তারপর—

মৃদুল মুখ টিপে হাসছিল।

হাসলি যে।

যদি না যাই?

দীননাথ অবাক হয়ে বলে, যাবি না?

মৃদুল একটা আড়মোড়া ভেঙে বলে, ইচ্ছে যাচ্ছে না। আমার কত কী হারিয়ে গিয়েছিল দীনুদা। স্মৃতি, বাঁশি, ঘুড়ি ওড়ানো, রুকু। এ বাড়ির আনাচে-কানাচে আর পথে-ঘাটে হঠাৎ হঠাৎ পুরনো হারানো জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে যাচ্ছি। যেন গুপ্তধন।

দীননাথের কেঠো মুখখানায় যেন হঠাৎ একটা দ্যুতি ফুটে উঠল। একটু ঝুঁকে বলল, সত্যি বলছিস?

BanglaBook.org

ভাবছি দীনুদা, ভাবছি, তুমি আত্মায় বিশ্বাস করো?

এই তো মুশকিলে ফেললি। ও বড় গোলমেলে জিনিস।

আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এ বাড়িতে যেন বিশুষ্ক প্রবাসের পর দাদা ফিরে এসেছে, জ্যাঠামশাই আছে, বাবা-মা এসে জুটেছে, বাড়ির উঠোনে গোল্লাছুট খেলছে মেয়েরা।

তুই পাগল আছিস। তা পাগলামিই বা খারাপ কী? পাগল ছাড়া কি দুনিয়া চলে!

আগল ভাঙা পাগল এল মধ্যরাতে। ক্ষ্যাপা মহিষের মতো ঝড়। তুমুল বৃষ্টি।

মৃদুল ঘুম ভেঙে উঠে বসল। খোলা জানালা দিয়ে জলের তীব্র ছাঁট আসছে ঘরে। সাদাটে জানালায় চৌখুপির দিকে চেয়ে সে সাপের জিহ্বার মতো বিদ্যুতের চকিত উদ্ভাস দেখতে পাচ্ছে। বজ্রাঘাতে বার বার কেঁপে উঠছে বাড়ি।

কাঁথাটা গায়ে টেনে নিল সে। চোখ বুজল।

বাঁশিওয়ালা! ও বাঁশিওয়ালা! এরকম ঝড়ের রাতে আমার যখন খুব ভয় করবে তখন বুকের মধ্যে শক্ত করে ধরে রেখো আমায়।

তাই তো নিয়ম।

আর বাঁশিওয়ালা, জানালা দরজা অমন হাট করে খুলে রাখ কেন? আমার বড় বে-আব্রু লাগে। তোমার মতো পুরুষ তো নই, আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের আড়াল করে রাখতে হয় জানো না?

মায়ামির সমুদ্রতীর তো তুমি দেখনি! মেয়েরা জাঙ্গিয়া পরে—

চুপ। অসভ্যদের দেশে আর যেয়ো না তুমি। কেন গিয়েছিলে? তোমাকে কি ওখানে মানায়!

তাই হবে বুঝি!

আর বাঁশিওয়ালা।

বলো।

কেন তুমি সব কেড়ে নাও আমার! কী করে নাও! মন্ত্র জানো?

BanglaBook.org

না তো!

তাহলে আমাদের পুষি বেড়াল কেন তোমার জানালায় বসে থাকে? আমাদের সড়ালে কুকুর কেন লেজ নাড়ে তুমি এলে। আমার সব আনন্দ কেন চলে যায় তোমার কাছে!

কাঙালকে কি অত দিতে আছে?

আর বাঁশিওয়ালা, আমি কিন্তু রুকু নই।

জানি।

আর বাঁশিওয়ালা। তুমি জেগে আছ, আমি টের পাচ্ছি। আমি যে জেগে আছি তা কি টের পাও তুমি?

পাই।

আমি যে তোমার জন্য কাঁদি, টের পাও?

হয়তো পাই।

আর বাঁশিওয়ালা।

বলো।

আবার দেখা হলে আমার যে কী ভীষণ লজ্জা করবে! কী ভীষণ—

এক উজ্জ্বল সকালে ঘুম ভাঙল মৃদুলের। চারদিকে ভোরের অতুল ঐশ্বর্যরাশি ছড়িয়ে রয়েছে যেন! জলে মুখ ধুয়ে সূর্য উঠল ওই। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। এই আশ্চর্য সকালে সে কাউকে একটা কথা বলতে চায়। বলতে চায়, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই। আমি আর কোথাও যাব না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কোলাজ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মানুষ ভিজলে ততটা ক্ষতি নেই, কিন্তু মোবাইল ভিজলে সর্বনাশ। গৌরাঙ্গও তাই এই সরু দাগের বৃষ্টিতে ভিজতেও সাহস করল না। দৌড়ে প্রথমে একটা বোকার মতো গাছতলায় এবং তারপর বেগতিক বুঝে কালীবাড়ির ফটকে ঢুকে চটিসুদ্ধু নাটমণ্ডপে উঠে পড়ল। এই ছাউনির তলায় বসে ভক্তরা সন্ধেবেলায় আরতি দেখে। তাই চটিজোড়া নিয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল। তবে কেউ দেখছে না, এই যা।

নাটমণ্ডপের মেঝেটা বাঁধানো হলেও ছাদ পাকা নয়। টিনের চাল। চালের তলায় চটের সিলিং, এখানে সেখানে চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে। বাইরে সরু দাগের বৃষ্টি এখন মোটা দাগে পড়ছে। আর একটু বাড়লে মুষলধারা। ঠিক বাগান নয়, তবে কালীবাড়ির ঘেরা জমিতে গাছপালা বড় কম নেই। তারই একটার দিকে চেয়ে ছিল গৌরাঙ্গ। দেড় মানুষ উঁচু টগর গাছ। তাতে হাঁদার মতো দাঁত বের করে অজস্র টগর ফুল ফুটে আছে। এই ফুটে থাকার কোনও মানে হয়? একেই তো ফালতু ফুল, তার ওপর কেরামতি দেখাতে ফুটেছে হাজারে বিজারে। ফোট শালারা।

ছাতা এখন বেজায় শস্তা। ঘ্যামা জিনিসের কথা আলাদা, কিন্তু ফুটপাথে আজকাল চল্লিশ পঞ্চাশে দিব্যি ছাতা মেলে। কিছু খারাপও নয়। ফোল্ডিং আছে, নাইলনটাও খারাপ নয়। দু' পাঁচ বছর চলে যায়। দু' দফায় মা আর বড় মামা ছাতা কেনার জন্য পঞ্চাশ টাকা করে দিয়েছিল তাকে, ফুঁকে দিয়েছে। কিনলেও লাভ ছিল না। হারাত। গৌরাঙ্গর হারানো জিনিসের লিস্টি বেশ লম্বা। দু' দুটো মোবাইল ফোন, অন্তত তিন জোড়া চটি, একটা নতুন দামি জিনসের প্যান্ট (বিভিন্ন কেনাকাটা করার সময়ে কোন দোকানে যে প্যাকেটটা ফেলে এসেছিল তা মনে

পড়েনি), অজস্র ডট এবং জেল পেন, দুটো হাতঘড়ি এবং একজন প্রেমিকা।

টুকুন যে সুন্দরী ছিল এমন নয়। অ্যাট্রাকটিভও নয়। মোটামুটি চলেবল ছিল আর কি। তবে বেশ মায়াদয়া ছিল। বিয়ের আগে শেষ দিকটায় খুব উদ্বেগের সঙ্গে মাঝে মাঝে বলত, তুমি তো কিছুই করছ না, কী হবে আমাদের বলো তো! ওইটিই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এই কিছুই না-করা। চৈতন্য, নিমাই আর গৌরাঙ্গ। তারা তিন ভাই। সহেলী আর কুহেলী দুই বোন। চৈতন্য ডাক্তার, নিমাই অধ্যাপক, সহেলী মাইক্রোবায়োলজিতে ডক্টরেট করায় ভাল বর পেয়ে এখন আমেরিকায়, কুহেলী চেহারার গুণে দিল্লিতে এক আমলার বউ। গৌরাঙ্গ ছোট, চার দাদা ও দিদির পর। সে না জন্মালেও কোনও ক্ষতি ছিল বলে তার মনে হয় না।

বৃষ্টি চেপে নামল, এখন মুষলধারা, দশ পনেরো মিনিট এরকম চললে রাস্তাটা ডুববে। কালীবাড়ির মাঠে জল জমেই ছিল, সেটা বেড়ে রাস্তার সঙ্গে একাকার হতে দেরি নেই। এই ধূসর ভেজা দুপুরে শুধু একটা জিনিস, বেশ লাগে গৌরাঙ্গর। ব্যাঙ ডাকছে। ব্যাঙের ডাক, কেন কে জানে, তার ভারী ভাল লাগে।

ছাঁট আসছে বলে একটু ভিতরে সরে এল সে। নাটমণ্ডপটায় এখন ভাসাভাসি কাণ্ড। অন্তত চার জায়গায় কলের মতো জল পড়ছে। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে তুমুল করতালির মতো।

একবার বুক পকেটে হাত দিল। ফোন বাজল কি? না বোধহয়। বৃষ্টির এই গহন গভীর শব্দে তার ফোনের শব্দ ডুবে যাওয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গে একবার বের করে দেখল, কল নয়, তবে মেসেজ আছে।

আজ সকালেই জরুরি মেসেজটা পেয়েছিল গৌরাঙ্গ। খুব দরকার, আজ দুপুরে। ফুটুর বাড়ি। প্লিজ ফোন করবেন না, বিটু।

গাড্ডা, সারা রাত কখনও মুষলধারে, কখনও ফুলঝুরির মতো নাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে। সকালে তখনও সরু দাগের শব্দহীন বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। গলি জলের তলায় নিশ্চিহ্ন। ভেজা, স্যাঁতানো, ন্যাতানো একটা দিন

সামনে। রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই, আর, কী কারণে কে জানে, বিটু তাকে মোটেই পছন্দ করে না। কাজেই এই জরুরি ডাকটাকে আরও জরুরি মনে হচ্ছে।

বিটু হল মৃণালের ভাবী বউ। মৃণাল গৌরাঙ্গর দু' বছরের বড় জ্যাঠতুতো ভাই। আসলে তারা ভীষণ বন্ধু, সেই ছেলেবেলা থেকেই পাশাপাশি বাড়িতে বড় হয়েছে। মৃণালকে কখনও দাদা বলে ডাকেনি গৌরাঙ্গ, ডাকার কথা ভাবতেই পারেনি।

বিষম চরিত্র পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলে কি কোনও কথা আছে? না থাকলেও থাকা উচিত ছিল। কারণ মৃণাল ছিল বরাবর ঠান্ডা, সুস্থির, মেধাবী, শৃঙ্খলাপরায়ণ ছেলে, স্কুলের গুড বয়। অন্য একটা স্কুলে দুই ক্লাস নিচুতে পড়ত গৌরাঙ্গ। লেখাপড়ায় খারাপ, বদমাশ, মারকুট্টা, অসভ্য হিসেবে অল্প বয়সেই কুখ্যাত। ভাল ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল ছিল সেটা। বারবার গার্জিয়ানকে কল করে সাবধান করত স্কুলের কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ক্লাস সেভেনে তারা টিসি ধরিয়ে দেয়। ফলে আর ভাল স্কুল হল না, পাড়ারই একটা লজঝড়ে স্কুলে তাকে ভরতি করে দেওয়া হল। আর এখানেই সে পেয়ে গেল নিজের পালকের পাখিদের। বিড়ি-ফোঁকা, স্কুল পালানো, লেখাপড়ায় গাড্ডু, মারকুট্টা সব ছেলে। ভারী আরাম বোধ করত সে। হ্যাঁ এই তো তার ঠিক জায়গা। পরিবারে, পাড়ায়, আত্মীয়মহলে গৌরাঙ্গ ছিল মার্কামারা বদ ছেলে তবু গুডবয় মৃণালের সঙ্গে একটা ভারী ভাল বন্ধুত্ব বরাবর থেকে গেল তার। কেন যে কে বলবে! মৃণাল শান্ত, ভাল, মেধাবী এবং একটু মিনমিনে আর ভিতু। একবার মৃণাল ক্লাস মনিটর ছিল। স্কুলটা খুবই ভাল, মেধাবীদের স্কুল। তবে মেধাবীদের মধ্যেও বদমাশ আর পাজি বহুৎ থাকে। সেরকমই একটা ছেলে ছিল বিমলাংশু। সে বক্সিং-টক্সিং করত। ক্লাসে অফ পিরিয়ডে হাই ডেস্কে উঠে পাখার ব্লেড বেঁকিয়ে দিয়েছিল বলে মৃণাল তার নামে রিপোর্ট করে। বিমলাংশু বলেছিল তাকে দেখে নেবে। নিয়েওছিল। স্কুল ছুটির পর গেটের বাইরে বিমলাংশু আর তার দুই বন্ধু মিলে বেজায় পিটিয়েছিল মৃণালকে। মুখ রক্তাক্ত, জামা ছেঁড়া, হাতঘড়ি

উধাও, চুল উশকোখুশকো। বাড়িতে হইচই হওয়ায় গৌরাঙ্গ গিয়ে সব শুনল। পরদিন সে গিয়ে মৃণালের স্কুলের বাইরে ওঁত পেতে রইল। বিমলাংশুকে চিনিয়ে দেওয়ার দরকার হয়নি। বিবরণটা মনে ছিল, গৌরাঙ্গ ঠিকই চিনেছিল তাকে। গিয়ে সোজা তার পথ আটকে বলল, তুমিই শালা বিমলাংশু? বিমলাংশু একটু হকচকিয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই তেড়ে এসেছিল, মস্তানি দেখাচ্ছ? বিমলাংশুর ধারণা ছিল ওটা তার স্কুল, তার এলাকা, বাইরের ছেলে কী করবে? কিন্তু গৌরাঙ্গ মারপিটে সিদ্ধহস্ত, সে জানে অধিকাংশ ছেলেই ভেড়ুয়া, আক্রমণ দেখলে পালায়। সুতরাং বিমলাংশু আর তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা আরও জনা তিনেককে একাই পিটিয়ে পাট পাট করে দিল গৌরাঙ্গ। বক্সিং কোনও কাজে আসেনি বিমলাংশুর। বক্সিং তো নিয়মের লড়াই কিন্তু স্ট্রিটফাইট তো নিয়ম মেনে হয় না। সে পারবে কেন?

শুনে মৃণাল ঘাবড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ফলটা শেষ অবধি খারাপ হয়নি। কারণ, পরদিনই বিমলাংশু মৃণালের সঙ্গে ভাব করে নেয়।

যে কোনও বিপদে সংকটে মৃণালের গৌরাঙ্গকে দরকার হত। গৌরাঙ্গর সঙ্গে পরামর্শ না করে সে কোনও কাজ করত না কখনও।

যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় মৃণাল একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। বিটু, মেয়েটা ইংরিজি অনার্সের ছাত্রী। বড়লোকের মেয়ে, গাড়িতে যাতায়াত, মৃণাল একতরফা প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, মেয়েটাকে জানাতেও পারছে না। অগত্যা অগতির গতি গৌরাঙ্গকে এসে ধরল, তুই একটা গতি করে দে। মৃণালকে অনেক গাড্ডা পার করেছে গৌরাঙ্গ। বলল, ঠিক আছে, কিন্তু নার্ভ শক্ত রাখিস।

পরদিনই কলেজের চত্বরে ঝিলের ধারে সে মুখোমুখি হল বিটুর। ফুটফুটে মেয়ে, বড় ঘরের নির্ভুল ছাপ আছে চেহারায়। খুব হাসাহাসি করছিল দুই বান্ধবীর সঙ্গে বসে।

গৌরাঙ্গ সোজা গিয়ে সামনে হাজির হয়ে বলল, একটু শুনবেন, জরুরি কথা আছে।

ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত বিটু বলল, কী কথা?

একটু প্রাইভেট।

কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনিই না।

আমাকে না চিনলেও চলবে। আমি একজনের বার্তাবহ। দু' মিনিট সময় দিন প্লিজ!

স্মার্ট মেয়ে, টপ করে উঠে এল, মুখে একটু বিচ্ছুর মতো হাসিও, সোজা সপাটে বলল, কী, প্রেম নিবেদন করতে চান, না কি?

গৌরাঙ্গ জিভ কেটে হেসে বলল, আরে না না, ছিঃ ছিঃ। আমি নই আর আমি তেমন ভাল ছেলেও নই। আমার দাদা, একটু নার্ভাস টাইপ, কিন্তু দাদা ভাল ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইনাল ইয়ার। একটু যদি তার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হন।

উনি নিজেই তো আসতে পারতেন। ভায়া মিডিয়া কেন?

ও একটু ওরকম, ডেকে আনি?

বিটু আপত্তি করেনি।

সম্পর্কটা হতেও সময় লাগেনি। এক কথা, মৃণাল অতিশয় সুপুরুষ, টকটকে ফরসা রং, এক মাথা কোঁকড়া চুল, চোখ নাক মুখের কাটিং চমৎকার। তার ওপর দুর্দান্ত ছাত্র এবং মিঠে রবীন্দ্রসংগীতের গলা।

দিন তিনেক বাদে মৃণাল এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে আবেগময় গলায় বলেছিল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ গোরা।

এসব বছর তিনেক আগেকার কথা। তারপর জল অনেক গড়িয়েছে। মৃণাল পাশটাশ করে চাকরি নিয়ে জামশেদপুর চলে যায়। বছর খানেক বাদেই কলকাতায় ট্রান্সফার হয়। ভাল চাকরি, বিটুর সঙ্গে সম্পর্কটাও অনেক প্রগাঢ় হয়েছে। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

গৌরাঙ্গ প্রত্যক্ষ খবর রাখে না। কারণ ইতিমধ্যে তার জীবনেরও জল কিছু ঘোলা হয়েছে। তার প্যাথোলজিস্ট বাবা কলকাতায় একটা ছোটমতো ল্যাবরেটরি খুলেছিল। কিন্তু সেটা তেমন চালু ছিল না।

বাবার বন্ধু রানিগঞ্জের ঠিকাদার মদনকাকা এসে একদিন বাবাকে পাকড়াও করলেন। বললেন, কলম্বাস যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল আমিও তেমনি একটা নতুন জায়গা আবিষ্কার করেছি,

রানিগঞ্জ। ওখানে ইচ্ছে-ঠাকরুন ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে যা চায় তাই পায়। কেন এই কলকাতার ঘেঁষাঘেঁষির বাজারে ওই মরকুটে ল্যাবরেটরি খুলে বসে মাছি তাড়াচ্ছিস! চল তো দেখি রানিগঞ্জে দু'দিনে তোর হিল্লে হয় কিনা দেখি।

গৌরাঙ্গর বাবা মনুজেশ মিশ্র এতই ঘরকুনো আর ভিতু লোক যে, বাড়ি থেকে অনেক দূর যেতে হবে বলে বিলেতে যাননি। ঢাকুরিয়ার বাইরের জগৎটা তাঁর কাছে অচেনা এবং আবছা। নিজের ছোট চৌহদ্দির বাইরে যেতে তাঁর মোটেই পা ওঠে না। কিন্তু মদনকাকার চাপাচাপিতে গিয়ে পাক্কা সাত দিন রানিগঞ্জে থেকে হাল হকিকত জেনে এলেন। জায়গা নাকি মন্দ নয়। তবে—, ওই "তবে"-র দ্বিধা কাটিয়ে দিতে মা আসরে নেমে পড়লেন। মনুজেশ দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ভয় খান স্ত্রীর ঝংকারকে।

অবশেষে আদ্যন্ত কাপুরুষ, ঘরকুনো মনুজেশ একদিন দুর্গা বলে রানিগঞ্জে রওনা দিলেন, ট্রাকে তাঁর মালপত্র নিয়ে। সঙ্গে গৌরাঙ্গ।

রানিগঞ্জে কী কী বাধার সম্মুখীন হতে হবে তার একটা আঁচ বুদ্ধিমান মদনকাকা গোপনে গৌরাঙ্গকে দিয়ে রেখেছিলেন। মাফিয়াদের দাপট আছে, তোলাবাজদের উৎপাত আছে, পলিটিক্যাল পার্টি আছে, ডাক্তারদের সঙ্গে পি আর, হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা এবং পুলিশের সঙ্গে বুঝে-সুঝে চলার ব্যাপার আছে। মদনকাকা বললেন, মনুজেশ ভাল মানুষ, ইমপ্র্যাকটিক্যাল, সহজে ঘাবড়ে যাবে, তুই একটু সড়ালে আছিস, ওগুলো সামলে নিস, দেখিস বাবা, হুজ্জোতে যাস না, তুষ্ণী ভাব নিয়ে চলবি। আর আমি তো আছিই।

রানিগঞ্জে নামতেই ইচ্ছে-ঠাকরুনের সঙ্গে তাদের মোলাকাত হয়ে গিয়েছিল এমন নয়। তবে নানা ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর আঁচলের আভাস বা চুড়ির শব্দ বা পায়ের চিহ্নের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল। মনুজেশ অবশ্য নতুন জায়গায় ভাড়া বাড়িতে ল্যাবরেটরি খুলতে গিয়ে দমসম হয়ে হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। বাস্তবিক তোলাবাজ, আড়কাঠি, প্রচ্ছন্ন হুমকি এবং অসহযোগিতায় নাজেহাল মনুজেশ সাত দিনের

মাথাতেই কলকাতায় ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে লাগলেন। গৌরাঙ্গ বলল, এসব তো হয়ই, ঘাবড়াচ্ছ কেন? নতুন জায়গায় সেট হতে একটু সময় লাগবে। আমার মনে হচ্ছে এখানে প্রসপেক্ট আছে।

মনুজেশ ভরসা পেলেন না। তবে ল্যাবরেটরি খুলতে বিস্তর টাকা দেনা করে ফেলেছেন, তাঁর ছুঁচো গেলার অবস্থা। চারদিকে রাক্ষস, খোক্কস, রক্তচোষাদের দেখতে পাচ্ছেন। খাওয়া কমে গেল, রাতে ঘুম হয় না, দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে উঠে পায়চারি করেন।

মদনকাকা এসে সান্ত্বনা দেন, ওরে প্রথমটায় দু'চারটে ক্যাচ ওঠে, বলের লাইন মিস হয়, তারপর ব্যাটে বলে যখন হতে থাকবে তখন দেখবি চৌকো আর ছক্কার ছড়াছড়ি।

একদিন ইচ্ছে-ঠাকরুন নিজেই এসে হাজির হলেন। আর লুকোছাপার হ্যাপা নেই। তাঁর পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, খাকি জামা, মাথায় খাকি টুপি, পায়ে বুট, ইয়া তাগড়াই গোঁফ। তবে ফরসা এবং শিষ্ট চেহারা। বলল, কার সঙ্গে কথা বলা যাবে?

গৌরাঙ্গ বলল, আমার সঙ্গে।

বিজনেস চাই তো!

তা তো চাই, ব্যবস্থা হবে?

হোবে।

লোকটা পকেট থেকে একটা লিস্টি বের করে গৌরাঙ্গর হাতে ধরিয়ে দিল। ডাক্তার, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদির নাম-ঠিকানা, তারা কে কী প্রত্যাশা করে, কার ছেলে একান্ন ইঞ্চির টি ভি সেট, কার বউ মারুতি জেন বা কার নিজেরই একটা ল্যাপটপের বায়না হয়েছে, সেসবও লেখা আছে লিস্টে। লোকটা পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো বলল, ঘাবড়াবেন না। ওসব প্রথমেই দিতে হোবে না, বিজনেস মিললে তবে দিবেন। ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা ভি হোবে।

ইচ্ছে-ঠাকরুন, ওরফে নন্দলাল বালা নামক সেই লোকটি মনুজেশের স্বপ্নলোকের চাবি গৌরাঙ্গের হাতে তুলে দিয়ে গেল।

ছয় মাসের মধ্যে মনুজেশের ছোট্ট ল্যাবরেটরি সোনার ডিম পাড়তে

লাগল। টাকার আমদানি দেখে মনুজেশ দিশাহারা। এক বছরের মধ্যেই জমি কিনে ল্যাবরেটরির জন্য বড় বিল্ডিং-এর বরাত দিয়ে ফেললেন মনুজেশ। দেড় বছরের মাথায় অনিচ্ছুক বড় ছেলে ডাক্তার চৈতন্য মিশ্রকেও ঘাড়ে ধরে এনে রানিগঞ্জে চেম্বার খোলালেন।

জীবনে এই প্রথম বেঁচে থাকার স্বাদ পাচ্ছিলেন মনুজেশ। তাঁর বয়স কমে গেল, চেহারায় যেন যৌবন ফিরে এল, মুখে সর্বদা প্রসন্ন হাসি এবং চাপা অহংকার বিরাজ করছে।

এই যে মনুজেশের এবং সেই সঙ্গে ঢাকুরিয়ার মধ্যবিত্ত মিশ্র পরিবারটিরও একটা ঝটিতি অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল তার কারণ একটি অদ্ভুত লোক, নন্দলাল বালা। সর্বদাই তার পরনে অফিস-পিয়নের মতো খাকি পোশাক, ভাবলেশহীন মুখ, শিষ্ট ও শান্ত স্বভাব। খুব সংক্ষেপে এবং প্রায় সংকেতে কথা কয়। নিজেকে কখনও জাহির করে না। তবু বালাজিকে গোটা রানিগঞ্জ এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় এক ডাকে চেনে। চেনে, তার কারণ, বালাজি প্রায় সর্বত্র এবং সব কিছুর মধ্যেই কোনও না কোনও ভাবে আছে। এত ছড়ানো একটা লোক কী করে এত কম কথা কয় এবং চিরহাস্য নির্বিকার মুখে এই বিপুল জনসংযোগ রক্ষা করে সেটাই এক বিস্ময়।

বালাজিকে বলা যায় সাপ্লায়ার আর সেই সাপ্লাইয়ের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। কমপিউটার বা ল্যাপটপ, টি ভি সেট, মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, স্টিলের আলমারি, রোলেক্স বা লংগিনস ঘড়ি, প্রফেশন্যাল বা শৌখিন ক্যামেরা, পারফিউম, অফিস বা বাড়ির ফার্নিচার, দুর্লভ কেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ, অর্থাৎ সব পেয়েছির দেশ। তাও কোনও বিজ্ঞাপিত বা ঝকঝকে শো-রুম নয়, বাজারের এঁদো গলির ভিতরে একটা বিশাল গো-ডাউন, যেখানে সব সময়েই মৃদু আলো ও অনেক বেশি অন্ধকার জমে থাকে। যে-জিনিস চটজলদি পাওয়া যায় না, অর্ডার দিলে চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তা খদ্দেরের কাছে পৌঁছে যায়।

ভূতের মতো লম্বা হাত আছে বালাজির। সেই হাত কখনও কলকাতা, কখনও দিল্লি, কখনও বোম্বাই, কখনও সিঙ্গাপুর বা হংকং বা ব্যাংককের

বাজার থেকে তুলে আনছে জিনিস। কোনও শখ শৌখিনতা নেই, মদ-মেয়েমানুষ নেই, হোমো নয়। বিলাস-ফ্যাশন-আরাম বা আয়েস নেই। একটা রক্তমাংসের মানুষ এরকম কী করে হতে পারে তা ভেবে পায় না গৌরাঙ্গ। মধ্যচল্লিশেও লোকটা বিয়ে করেনি, করবেও না। লোকটার মোজাস অপারেন্ডিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। দোকানে বসে খদ্দের ধরার চেষ্টা করে না কখনও। কিন্তু যখনই যে কোনও লোকের বালাজিকে দরকার হয় তখনই ঠিক সেইখানে পৌঁছে যায়।

প্রায় বছর দুয়েক এ লোকটাকে চেনার চেষ্টা করেছে গৌরাঙ্গ। শেষ অবধি তার ধারণা হয়েছে, মোট চারটে জিনিস দিয়ে বালাজি নামক বস্তুটি তৈরি হয়েছে। বালাজির খানিকটা পাথর, খানিকটা যন্ত্রমানব, খানিকটা ভূত এবং বাকিটা ঈশ্বর।

এক দুপুরে বালাজির কাছে বসে ছিল সে। বালাজি তখন, বেলা দেড়টার সময় দুখানা চাপাটি, সর্ষোকা শাক, ডাল আর আচার দিয়ে তার নিরাবেগ লাঞ্চ সারছে। গৌরাঙ্গ বকবক করে যাচ্ছিল, বালাজি নীরবে শুনে যাচ্ছে। মুখে কথা ছিল না। খাওয়া শেষ করে, বাঁ হাতে ঘটি তুলে খানিকটা জল গিলে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বলল, এ জায়গা আপনার জন্য নয়। পালিয়ে যান।

গৌরাঙ্গর বাক্য হরে গেল। গো-ডাউনের পিছনে ছোট একটা নিরলঙ্কার আধো অন্ধকার ঘর। একজন দীর্ঘকায়, কেঠো চেহারার প্রেতের মতো মানুষ ওই যে একটা বাক্য বলে চুপ করে গেল, আর কোনও ব্যাখ্যা বা টীকা-ভাষ্য বা দ্বিতীয় বাক্যও ব্যবহার করল না, মুখের দরজাটি স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দিল, ওতেই বুকটা ধক করে উঠল গৌরাঙ্গর। মনে হল, বালাজি নয়, তার নিয়তিই তাকে হুঁশিয়ারি দিল। এ এক অমোঘ সংকেত, যেন দৈববাণী, অলঙ্ঘ্য।

ঘটনাটা সামান্যই। উপেক্ষা করাই যেত। কিন্তু গৌরাঙ্গর ভিতরে ওই বাক্যটা এমন ডংকা বাজিয়ে দিল যে, কিছুতেই আর মন টিকল না রানিগঞ্জে।

একটা সুবিধেও হল। ছোড়দা নিমাই বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে চাকরি

পেয়ে চলে যাচ্ছে, খবর পেয়েছিল তারা। সুতরাং ঢাকুরিয়ার বাড়ি অরক্ষিত পড়ে থাকবে, একতলায় একঘর ভাড়াটে ছাড়া আর কেউ নেই। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারও থাকা দরকার। গৌরাঙ্গর মা শোভনাদেবী কিছু দিন যাতায়াত করে সামাল দিচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য ব্যাপার নয়।

একটু গাঁইগুঁই করে মনুজেশ এবং শোভনা তাকে কলকাতায় ফিরে যেতে দিলেন।

মানুষ যত দিন বাঁচে সব সময়েই কিছু না কিছু শেখে। যখন শিখতে পেরে ওঠে না, তখন নকল করে। গৌরাঙ্গ নির্ভুল জানে, সে আজকাল বালাজিকে নকল করে। বালাজি হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাইরে বৃষ্টির জোর বাড়ছে। নাটমণ্ডপে আরও কয়েক জায়গায় তোড়ে জল পড়ে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দে যেন এক লাফাঙ্গা লুটেরার জয়ধ্বনি।

জীবনে যে কত কিছুর অভাব আছে তা সব সময়ে বোঝা যায় না, এক একটা প্রয়োজনের সময়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়। এই যেমন এখন একটা ছাতার অভাব সে টের পাচ্ছে। একটা ছাতা থাকলে, নিতান্ত ফুটপাথে লভ্য শস্তা ছাতা হলেও, ফুটুর বাড়ি এতটা দূর বলে মনে হত না। কাক-ভেজা হয়েও যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তখন ওরা জল মোছার তোয়ালে-টোয়ালে বা শুকনো জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে মনে মনে বিরক্ত হয়েও ভদ্রতা দেখাবে, গৌরাঙ্গের সেটা ভাল লাগবে না।

সুতরাং সে দাঁড়িয়ে রইল এবং টের পেল, আয়ুর মূল্যবান কিছু সময় অযথা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরো বালির মতো গলে পড়ে যাচ্ছে, যেমনটা প্রায় সব সময়েই যায়।

মৃণালের সঙ্গে দু' বছরের মতো দেখা নেই, জ্যাঠার বাড়িটা ঢাকুরিয়ায় তাদের বাড়ির পাশেই। কিন্তু মৃণাল বছরখানেক আগে গড়িয়াহাট কানেক্টারের পাশে বিজন সেতুর ওপারে কোথাও ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছে। ঠিকানাটা জানে না গৌরাঙ্গ।

একটা ঝটকা বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট খানিকটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল

গৌরাঙ্গকে। মাঠে জমা জলের ওপর একটা হিলিবিলি ঢোঁড়া সাপ চলে গেল তার কোনও শিকার বা রন্ধ্রের সন্ধানে।

আজকাল নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে গৌরাঙ্গ। নির্বিকার থাকা শক্ত কাজ নয়, চেষ্টা করলে পারা যায়। শক্ত কাজ হল, নির্বিকার থেকেও কী করে নিজের কাজ বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেইটে।

বৃষ্টি তার নিজস্ব নিয়মে আসে এবং যায়। কোন সংকেতে, কার অঙ্গুলিহেলনে এসব হয় কে জানে। বৃষ্টি প্রথমে তার উদ্দণ্ড পতনে একটু রাশ টানল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির ঝরোখায় বড় বড় ফাঁক দেখা দিতে লাগল। তারপর টেনে ধরল লাগাম।

গৌরাঙ্গ উর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশের স্লেটে লেখা অক্ষরগুলি পড়ার চেষ্টা করল। শালা বৃষ্টি কি কোথাও চালাকি করছে? ফিচলেমি? বাইরে পা রাখলেই ফের "দেখামাত্র গুলি"-র আদেশে ছুটে আসবে জলের অজস্র গুড়ুল?

বেকুবের মতো আজ চামড়ার চটিটাই পরেছে সে। বোকা জিনিস, জলে ভিজে জোড়টোড় খুলে যদি পটাং হয়ে যায় তাহলেই চিত্তির। খুব সাবধানে প্রায় পা টিপে জল ভেঙে এগোতে লাগল গৌরাঙ্গ। হার্ট অ্যাটাকের পর তার জ্যাঠামশাই একদিন বলেছিল, বুঝলি, যখন বুকে সেই মারাত্মক ব্যথাটা উঠল তখন মাত্র দু' ফুট দূরের বিছানাটাকেও মনে হচ্ছে যেন কত দূর। বিছানা পর্যন্ত পৌঁছোতে যেন ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার মতো পরিশ্রম! আজ ঠিক সেই রকম, ফুটুর বাড়িটাও যেন বৃষ্টির জলে ভেসে ভেসে কয়েক মাইল সরে গেছে। পথ ফুরোচ্ছে না। মানুষের শরীর ও মনের নানা পরিস্থিতিই দুনিয়ার অনেক সত্যকে বারবার উলটে-পালটে দেয়। দু' কদমের রাস্তা হয়ে যায় দুই যোজন, দু' মিনিটকে মনে হয় দু' ঘণ্টা, জ্যোৎস্না রাত্তিরকেও মনে হয় কী নির্লজ্জ আলো, মেরিলিন মনরোর দিকে তাকিয়েও নিজেকে গোরুর মতো নিষ্কাম মনে হয়।

মোড় ঘুরতেই ফুটুর বাড়ি।

বসুন! ওমা, চটি জোড়া বাইরে ছেড়ে এলেন কেন? এ পাড়ার

কুকুরগুলো ভীষণ পাজি। এই তো গত বছর এক শালওয়ালার এক পাটি চটি মুখে নিয়ে পালিয়ে গেল!

বিটু আসেনি?

আসবে। এই তো একটু আগে ফোন করেছিল। বৃষ্টিতে আটকে আছে। ওর তো আবার মারুতি। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেল কিনা কে জানে। চা খান। এসে পড়বে।

নামের মিল থাকলেও ফুটু আর বিটু পরস্পর বোন নয়, বন্ধু। ফুটু ক্যারিয়ার করেনি। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। তার সাফ কথা, আমার বাবা ঘর-সংসার করতেই ভাল লাগে। মর্দানি নয়। কড়ি, রঙিন মালসা, পটচিত্র, পুঁতি এই সব নানা জিনিস দিয়ে একরকম বেশ সাজিয়েছে বাইরের ঘরখানা। সাজানোটা কেমন হল তা অবশ্য বুঝতে পারে না গৌরাঙ্গ। কোনও দিনই তার আর্টের চোখ ছিল না।

ফুটুর কাজের মেয়ে চা নিয়ে এল। মেয়েটিকে ঝি বলে মনেই হয় না। পরনে ছাপা পাটভাঙা শাড়ি, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, হাত-পা, দাঁত অবধি ঝকঝক করছে পরিষ্কার। ঘরদোরের মতো ঝিকেও সাজিয়ে রেখেছে ফুটু। এটা বোধহয় হিউম্যান কাইন্ডনেস নয়, স্রেফ ম্যাচিং-এর জন্যই। তবে মেয়েটার চেহারা দেখনসই নয়। কালো, ভোঁতা নাক, বেঁটে। স্টেনলেস স্টিলের ট্রে-তে ফটফটে সাদা পাতলা পোর্সিলিনের কাপ এবং পিরিচ, চা চলকায়নি। আলাদা প্লেটে চৌকো নোনতা বিস্কুট। বেশ কেতাদুরস্ত ব্যাপার।

আপনি বোধহয় বেশ ভিজেছেন, না?

না না, ও কিছু নয়।

ছাতা নেই কেন সঙ্গে?

ছাতা থাকলেই হারায়।

আমার কর্তাটির তো এ পর্যন্ত দশ-বারোটা গেছে। গাড়ি কেনার পর আর ছাতা কিনতে হয় না।

রানিগঞ্জ ছাড়ার আগে সে শুনে এসেছে তার বাবা একটা ইন্ডিকা আর

দাদা চৈতন্য একটা সুমো বুক করেছে বালাজির কাছে। এত দিনে এসেও গেছে বোধহয়।

চা-টা বোধহয় ভাল। চমৎকার ফ্লেভার, দুধ চিনি ঠিকঠাক তবে এ চা তাদের জন্য নয়। কড়া লিকার, কড়া চিনি, একটু ঘন দুধ হলে চা চাঁটি মারে। এই ফিনফিনে চায়ের এফেক্ট নেই তেমন।

কলকাতায় ফিরে এলেন কেন? আমরা তো ভেবেছিলাম আপনি পারমানেন্টলি রানিগঞ্জেই থেকে যাবেন।

গৌরাঙ্গ মৃদু হেসে বলল, রানিগঞ্জ আমার জায়গা নয়।

তা অবশ্য ঠিক। কয়লার রাজ্যে কি গৌরাঙ্গকে মানায়? খাদানে নেমেছেন কখনও?

দু'বার।

খুব থ্রিলিং না? আমি একবার নেমেছিলাম। যা ভয় করছিল। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। আর ফ্ল্যাশ লাইটটা কী ভারী বলুন। কত বার যে মাথা ঠুকে গিয়েছিল বলার নয়। হেলমেট না থাকলে মরেই যেতাম।

হ্যাঁ, বিপদ সর্বত্র আছে। খাদানে, খাদানের বাইরেও। আপনি রানিগঞ্জে ছিলেন নাকি কখনও?

না। আমার এক মামা থাকেন। কোলিয়ারির সেফটি ম্যানেজার। মাঝে মাঝে যেতাম।

নাম কী বলুন তো?

অনিল চক্রবর্তী। চিনবেন না। দু' বছর আগে রিটায়ার করেছেন। এখন পণ্ডিতিয়ার বাড়িতে বসে কমপিউটারের সঙ্গে দাবা খেলেন।

চায়ের সঙ্গে বিস্কুট জিনিসটা কেন চালু আছে সেটাই গৌরাঙ্গ ভেবে পায় না, বরং বিস্কুটটা চা-কে যথেষ্ট ডিস্টার্ব করে। চা খাও, ঠিক আছে। বিস্কুট খাও, তাও ঠিক আছে। কিন্তু বিস্কুট দিয়ে চা নয়। হ্যাঁ, আর অনিল চক্রবর্তী নামটা। এরকম কামড়হীন নাম আর হয় না। শুনলে কানে বা মগজে কোনও ধাক্কা লাগে না। অনিল কুম্বলে, অনিল আম্বানী, অনিল চ্যাটার্জি, অনিল বিশ্বাস। চারদিকে কয়েক লক্ষ অনিল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কী হল, চুপ করে আছেন যে! রানিগঞ্জ থেকে ফেরার পর আপনার কি একটু পরিবর্তন হয়েছে?

কী পরিবর্তন?

একটু পেনসিভ হয়েছেন কি? ভাবুক?

আগে কি আমি একটু টকেটিভ ছিলাম?

না, আপনি বরাবরই কথা একটু কমই বলেন। তবে এত কম নয়। খুব বেশি গম্ভীর হবেন না যেন। মেয়েরা গম্ভীর মানুষকে ভয় পায়।

গৌরাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, আরে না, গম্ভীর হতে যাব কেন?

কী করছেন এখন শুনি? চাকরি?

না। চাকরি আর হল কই? এই কোয়ালিফিকেশানে হওয়ার কথাও নয়।

ফুটু উদাস গলায় বলল, আমি অবশ্য চাকরি-বাকরির জগতের খবর রাখি না। শুনতে পাই, দেশে নাকি খুব বেকার!

হ্যাঁ, দেশে অনেক বেকার। আমিও তাদেরই একজন।

হরেক রঙের ছোট-বড় নানা সাইজের পোলকা ডটওয়ালা ভারী সুন্দর তাঁতের শাড়ি পরে মুখোমুখি বসে আছে ফুটু। ফুটফুটে সুন্দরী ছিল বলেই নাকি ওর নাম ফুটু। এক সময়ে এ বাড়িতেই মৃণাল আর বিটু মিট করত। আর সেই আড্ডায় মাঝে মাঝেই গৌরাঙ্গকেও টেনে আনত মৃণাল। বেশ আড্ডা হত।

আপনি তো মৃণালের ভাই, আবার বন্ধুও, তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ ও কথা কেন?

শুধু ভাই আর বন্ধুই নন, মৃণাল বলে আপনি নাকি ওর সেভিয়ারও।

ওটা বাড়াবাড়ি।

মৃণালকে আপনি অনেক সিচুয়েশান থেকে বাঁচিয়েছেন। এমনকী বিটুর সঙ্গে ওর মিটটাও আপনার কীর্তি।

ওঃ, এসব তো পুরনো কথা!

মাঝে মাঝে পুরনো কথা মনে করতে হয়। মৃণালের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কীরকম?

গৌরাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, নেই, একেবারেই নেই। গত দু' বছর ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি।

ফোনে কথা হয় না?

না। ওর ল্যান্ডলাইন বা সেলফোনের নম্বরও জানি না। শুনেছি, ফ্ল্যাট কিনে বিজন সেতুর ওপাশে কোথায় যেন চলে গেছে।

তাহলে আপনারা কেমন বন্ধু?

আমরা এখনও খুব ভাল বন্ধু। তবে জগৎটা আলাদা হওয়ায় যোগাযোগ কমে গেছে।

তা বলে খোঁজও রাখবেন না?

কেন, মৃণালের কি কিছু হয়েছে?

ওই বোধ হয় বিটু এল! দাঁড়ান তো— বলে উঠে গেল ফুটু।

বিটুকেও দু' বছর বাদে দেখল গৌরাঙ্গ। যেমন ছিল তেমনিই আছে। তবে বর্ষা বলেই বোধহয় তেমন সাজগোজ নেই। ম্যাড়ম্যাড়ে একটা টপ, আর নীচে জিনস। বিটু কোনও দিনই পছন্দ করত না গৌরাঙ্গকে। সেটা নানা সূক্ষ্ম ব্যবহারে বা কথায় বুঝিয়েও দিত। তাই গৌরাঙ্গ ফুটুর বাড়িতে ওদের আড্ডায় আসতে চাইত না। কয়েকবার এসেছে বটে, কিন্তু ভাল লাগেনি। আজ এই জরুরি তলবটা তাই একটু অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, দুশ্চিন্তারও।

কেমন আছেন গৌরাঙ্গ?

এই তো, ভালই। আপনি?

ঠিক আছি। ডেকে কোনও অসুবিধেয় ফেলিনি তো?

আরে না। আমার তো তেমন কোনও কাজ নেই।

শুনেছিলাম আপনি একটা ল্যাবরেটারির ম্যানেজার হয়েছেন?

পাগল নাকি? ম্যানেজারি নয়, তবে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সামলানোর জন্য ছিলাম। বাবার তো বয়স হয়েছে, দৌড়ঝাঁপ পারেন না।

চলে এলেন কেন?

ভাল লাগছিল না। একঘেয়ে কাজ, লোককে তোষামোদ করে চলা।

এখন কী করবেন?

ঠিক করিনি কিছু। আপাতত নানারকম রঙিন স্বপ্ন দেখছি, যেমন সব বেকারই দেখে। এখন আবু হোসেনের স্পেল চলছে!

ফুটু ভ্রু কুঁচকে বলল, আবু হোসেনটা আবার কে?

গৌরাঙ্গ মৃদু হেসে বলল, একজন ড্রিমার।

বিটু স্থির দৃষ্টিতে গৌরাঙ্গের দিকে চেয়ে ছিল, মুখে হাসি নেই। মৃদু স্বরে বলল, আপনি আর যাই হোক, ড্রিমার নন।

গৌরাঙ্গ সতর্কভাবে চুপ করে রইল। উচ্চশিক্ষিতা, স্মার্ট এবং ইংরিজি-জানা মেয়েদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়ার ঝামেলা আছে। কাজ কি কথা বাড়িয়ে?

আপনাকে যেজন্য ডেকেছি সেটা কি অনুমান করতে পারেন?

না তো!

মৃণাল আপনাকে কিছু বলেনি?

ওর সঙ্গে দু' বছর আমার কোনও যোগাযোগ নেই।

মৃণালও তাই বলে।

প্রবলেমটা কি মৃণালকে নিয়ে?

না। আপনাকে নিয়ে।

গৌরাঙ্গ থতমত খেয়ে বলল, আমাকে নিয়ে? কী আশ্চর্য! আমি তো কিছু করিনি! পিকচারেই নেই।

আছেন। ভীষণভাবে আছেন। এবং আপনার জন্যই শেষ অবধি আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে যেতে পারে।

ভীষণ অবাক গৌরাঙ্গ হাঁ করে কিছুক্ষণ বিটুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, সম্পর্ক ভেঙে যাবে! আমার জন্য? কিন্তু আমি কী করেছি একটু বলবেন?

আপনি যে কিছু করেননি সেটা আমি জানি। কিন্তু মৃণাল তা বুঝতে চাইছে না। তার হঠাৎ মনে হয়েছে, আপনার আর আমার মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

গৌরাঙ্গ খানিকটা বাতাস গিলে ফেলল। তারপর হেসে ফেলল। মাথা নেড়ে বলল, এ তো পাগলের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য নয়!

মৃণাল কি পাগল বলে আপনার মনে হয়?

না। কিন্তু গভীর সম্পর্ক বলতে মৃণাল কী বোঝাতে চাইছে তা জানেন?

সামথিং ডিপ। ভেরি ডিপ। মৃণাল হঠাৎ একদিন বুঝতে পেরেছে যে, আমি যা কিছু করছি সব আন্ডার এ হিপনোটিক স্পেল। এই যে ওর সঙ্গে আমার প্রেম এটা আসলে একটি প্লে-অ্যাক্টিং। আমাকে দিয়ে এটা করানো হচ্ছে। এবং আমি জাস্ট ক্যারিয়িং আউট দি অর্ডার ফ্রম এ পাওয়ারফুল পারসন। আর সেই ব্যক্তিটি আপনি। আপনি বাজিকর, আমি পুতুল, মৃণাল ভিকটিম।

হায় ভগবান! মৃণালের মাথায় এসব কে ঢোকাচ্ছে বলুন তো?

আপনি।

গৌরাঙ্গ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আমি! কী করে? কী ভাবে?

ছেলেবেলা থেকে আপনারা একসঙ্গে বড় হয়েছেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমরা একেবারে শিশুকাল থেকে বন্ধু।

কেমন বন্ধু?

বন্ধুরা যেমন হয়। সম্পর্কে মৃণাল আমার দাদা, আপন জ্যাঠতুতো দাদা। তবে কোনও দিন দাদা বলে ডাকিনি, মনেও করিনি। কিন্তু দু'জনে দারুণ ভাব ছিল। একমাত্র মৃণালের সঙ্গেই আমার কখনও ঝগড়া বা মারপিট হয়নি। ভীষণ নরম আর ভাল ছেলে ছিল মৃণাল। ভীষণ ভীষণ ভাল।

ওসব আমি জানি। মৃণাল সবই আমাকে বলেছে। আমি জানতে চাই, কবে থেকে এবং কীভাবে আপনি ওর কাছে সুপারহিরো হয়ে উঠলেন?

হিরো? হাসালেন। হিরো হওয়ার মতো কোয়ালিটি কোথায় আমার? লেখাপড়ায় গাড্ডু, হারমাদ টাইপের ছিলাম বলে কেউ পছন্দ করতও না, কোনও সাকসেস স্টোরি নেই। মৃণালের মতো সুপুরুষ, ফার্স্ট ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার এবং সৎ চরিত্রের ছেলের কাছে হিরো হব কী করে?

সেটা তো আমারও প্রশ্ন।

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

দুই

BanglaBook.org

বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে বিনা টিকিটেই ফিরছিল গোবিন্দ। অনেক কালের অভ্যাস। তার সোজা কথা হল, রেল হচ্ছে সরকার বাহাদুরের, আর আমরা হলুম গে সরকার বাহাদুরের প্রজা। তা বাপ-দাদার বাড়িতে কি কেউ ভাড়া দিয়ে থাকে। তাহলে টিকিটের পয়সা গুনতে যাব কেন?

হারান জ্যাঠা কানের কাছে তখন থেকে অবশ্য টিকটিক করেই যাচ্ছে, কাজটা ভাল করিসনি গোবিন্দ। অন্তত আজকের দিনটায় কেটে নিলে পারতিস দুখানা টিকিট। নতুন বউয়ের তো একটা সম্মান আছে। ধরা পড়লে ইজ্জত থাকবে?

ধরা না পড়লেই যেন থাকত? শুনে হাসি পায় গোবিন্দর।

ইজ্জত ইল্লত সেই কবেই খুইয়ে বসে আছে। দেশে নাকি এখন একশ কোটির বেশি মানুষ। গোরু-ছাগলের অধম। এত মানুষের ভিড়ে কার ইজ্জত খোয়া যাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় কেটা?

গোবিন্দ বলল, বলি জ্যাঠা, এ লাইনে টিকিটবাবু কখনও দেখেছ? আমি তো গত সাত বছরে দেখিনি।

না রে, আজকাল কড়াকড়ি হতে লেগেছে। এক এক দিন শেয়ালদায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাছি গলার উপায় নেই।

আহা, শেয়ালদায় যাচ্ছেটা কে? দৌড় তো সোনারপুর অবধি, তারপর ধু ধু মাঠ। চুপ করে বসে থাকো তো। চা খাবে?

তা নে।

পাশেই বেগুনি রঙের ঘোমটায় ঢাকা আস্ত একখানা রক্তমাংসের বউ বসে আছে। ভাবাই যায় না। শাড়িখানা বড্ড চকচকে, চোখে লাগে। শালারা কী মেটেরিয়াল দিয়ে যে এসব শাড়ি বানায় কে জানে বাবা। গোবিন্দ কাঠ চেনে, পালিশ চেনে, ডিজাইন চেনে, কিন্তু শাড়ি চেনে না। তবে জানে দামি জিনিস নয়, বউয়ের বাপ ঢ্যামনা মাল, ট্যাঁকের জোর নেই। বরযাত্রী বলতে তো শুধু হারানজ্যাঠা, তাতেই মোটে এক পিঠের রাহাখরচ ঠেকাল। সেকেন্ড ক্লাস লোকাল ট্রেনের

ভাড়া। গোবিন্দ অবশ্য যাওয়ার টিকিট কেটেছিল।

গলা খাঁকারি দিয়ে এবার বউকে জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ, চা খাবে?

বউ-মানুষ, একটু লজ্জার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ বা না কোনওটাই করল না, শুধু মাথাটা হঠাৎ নুয়ে পড়ল।

চা জলাটা আগে থেকেই ঘুরঘুর করছিল। গোবিন্দ বলল, ওরে, তিনটে চা দে তো বাবা গরম দেখে।

বউ গঙ্গার একখানা স্যুটকেস আছে আর দুখানা নাইলনের ব্যাগ। একটা ব্যাগ বউয়ের কোলে, স্যুটকেস আর একখানা ব্যাগ ওপরে তোলা, হারান জ্যাঠা হুঁশিয়ার চোখে নজর রাখছে। নতুন বউয়ের মুখখানা এখনও ভাল করে দেখা হয়নি গোবিন্দর। ও দেখার কিছু নেই। হা-ঘরে ঘরের মেয়েদের যেমন মুখ হয় আর কি। মনিষ্যি বলে চেনা গেলেই হল, ফিল্ম-এ তো নামতে হচ্ছে না রে বাপু। তবে হাত দুখানা দেখেছে। কালো, গোলগাল, তাতে গুচ্ছের কাচ বা সিটি গোল্ডের চুড়ি, শাঁখা-নোয়া। সেই দুখানা হাত এখন ভারী ব্যস্ত হয়ে কোলের ব্যাগখানার মুখের দড়ির বাঁধন খুলতে লাগল। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে এদিক ওদিক খুঁজে এক প্যাকেট নোনতা বিস্কুট বের করে এনে গোবিন্দর দিকে নীরবে এগিয়ে দিল। গোছানো মেয়ে তো।

দুখানা বিস্কুট হারান জ্যাঠার দিকে বাড়িয়ে দিল গোবিন্দ, নাও জ্যাঠা।

কেউ কেউ বিস্কুট ভারী ভালবাসে। যেমন হারান জ্যাঠা। খপ করে নিয়ে নিল।

গোবিন্দ বিস্কুট দু' চোখে দেখতে পারে না। তবু বউয়ের মহিমা রাখতে একখানা নিয়ে চায়ে ভিজিয়ে খেল।

সোঁদরবনের মেয়ে হলেও বউ একেবারে অগামার্কা নয়। গঙ্গা একসময়ে ছেলেবেলায় কলকাতায় এক পয়সাওলা লোকের বাড়িতে কাজ করত। সেখানে লেখাপড়াও নাকি শিখেছিল খানিক। তবে ডাগর হওয়ার পর তারা আর রাখতে চায়নি। কখন কার কুনজরে পড়ে, কার সঙ্গে ভেগে যায়, তার ওপর মেয়েদের মাসিক-টাসিকেরও ঝঞ্ঝাট আছে, ছোঁয়াছানি লেগে যায় কোথায়। গঙ্গার বাপই হাপরহাটি ব্যাখ্যান দিচ্ছিল

গোবিন্দকে। একবার কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না। সোঁদরবনে কথা কওয়ার লোকই বা পাবে কোথায়। এদিকে বুকের মধ্যেও কথা আর ব্যথা দুই-ই জমে জমে বুজকুড়ি কাটতে থাকে, না হলে আরাম পায় না। লোকটার তিনটে মেয়ে, তিনটেই যেন দুধেল গাই। কলকাতা, সোনারপুর আর কাকদ্বীপে কাজ করে পয়সা বানাচ্ছিল। তিনটেরই টপটপ বিয়ে হয়ে পয়সার আমদানি বন্ধ। গঙ্গাই তিন নম্বর, নতুন জামাই গোবিন্দকে তোয়াজ করছিল যদি বুড়ো শ্বশুরের দিকটাও একটু দেখে।

গোবিন্দ সার বুঝেছে, দেশটা হাড়হাভাতেতে ভরে যাচ্ছে, যার সঙ্গে দেখা হয় সেই হাড়হাভাতে। এ এক অশৈলী কাণ্ড বটে, চেকনাইওয়ালা লোক আজকাল মোটে দেখাই যাচ্ছে না। শ্বশুরবাড়িটা তার মোটেই পছন্দ হয়নি। বিজয়নগর নামটারই যা বাহার, সে একটা অখদ্দে গ্রাম। আর সে কি হেথা! মাইলের পর মাইল ঠেঙিয়ে তবে পৌঁছোনো। হারান জ্যাঠার কাণ্ডই ওরকম, এরকম দুর্গম জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আনতে আছে? দরমার বেড়া আর টিনের চালের কয়েকখানা ঘর, একটু উঠোন, একখানা হাজা-মজা পুকুর, ব্যস হয়ে গেল। কয়েক বিঘে ধানজমি আছে বলে শুনেছে।

প্লাস্টিকের কাপটা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গোবিন্দ পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। দু'দিন ধরে বন্ধ রেখেছিল। সোঁদরবনে না আছে নেটওয়ার্ক, না ইলেকট্রিক, তবু সঙ্গে নিয়েছিল কেতা দেখাতে, জামাইয়ের মোবাইল আছে, এটাও তো সে অঞ্চলে একটা বলে বেড়ানোর মতো কথা!

মোবাইলটা দিয়েছিল মিশ্রবাবু, খুব একটা দাতাগিরি মনে করলে ভুল হবে। আজকাল নিত্যি নতুন কায়দার মোবাইল বেরোচ্ছে, আর লোকে হামলে পড়ছে নতুন নতুন ফিচারওয়ালা হ্যান্ডসেটের জন্য। অনেকেরই একটা দুটো মোবাইল ফালতু পড়ে থাকে। জিনিসটার মোটেই সেকেন্ড হ্যান্ড বাজার নেই। তিন হাজারে কেনা পাঁচ-সাতশোয় বিকোতে চায় না। সেরকমই একখানা দয়া করে দিয়েছে গোবিন্দকে। তেমনি আবার মজুরি থেকে দুশো কমিয়ে ছেড়েছে। গোবিন্দও কি ছেড়েছে নাকি?

মালের দাম বাবদ পাঁচশোকে হাজারে তুলে আদায় করে নিয়েছে। যে সব পুরুষ বিয়ে করেনি তাদের মাথায় হাত বোলানো সোজা। টিকরমবাজ হচ্ছে মেয়েছেলেরা, বুঝুক না বুঝুক এমন কষে দরদাম করে যে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হয়।

এসে গেলুম রে! সব গুছিয়ে নে।

ও আর গোছানোর কী আছে জ্যাঠা? দুখানা বাক্স, দুটো পোঁটলা আর একটা বউ। নেমে যাব ঠিক।

উলটোবাগে নামবি নাকি? টিকিট করিসনি, শেষে ধরাটরা পড়লে—

পাগল নাকি? মালপত্র নিয়ে লাফিয়ে নেমে যেতে হাত-পা কেটেছড়ে যাক আর কি। প্ল্যাটফর্মেই নামব জ্যাঠা, যা হয় হবে।

টিকিট হারান জ্যাঠারও নেই। তবে জ্যাঠার পকেটে প্লাস্টিকের খাপে একখানা ছাপা কাগজ আছে। সেটা কী বস্তু তা জানে না গোবিন্দ, তবে ওইটে দেখিয়েই সর্বত্র টিকিটের কাজ চালানোর চেষ্টা করে জ্যাঠা। কেউ কেউ উচ্চবাচ্য না করে ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ আবার ঝগড়া লাগিয়ে দেয়, এটা কী দেখাচ্ছেন মশাই? এতে কি টিকিট মাপ হয়? জ্যাঠা অবশ্য অবিচল, তবে বুড়ো মানুষ হওয়ার কিছু সুবিধে তো আছেই। অনেকে বয়স দেখেই মাপ করে দেয়। তবে কাগজখানা কীসের তা আজও জানতে পারেনি গোবিন্দ। প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেট, নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামীর আইডেন্টিটি কার্ড, কে জানে বাবা। যা হোক একটা কিছু হবে। কোনও এমএলএ-টেমএলেকে ধরে বাগিয়েছে। কাজের কাজ তো হচ্ছে, পয়সা বেঁচে যাচ্ছে।

না আজও টিকিটবাবুর পাত্তা নেই। স্টেশনের ফটক হাঁ হাঁ করছে। তবে সোনারপুরে লোক নামল মেলা। হুড়হুড় করে বেরোচ্ছে সব। তাদের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলে টিকিটবাবু থেকেও সুবিধে করতে পারত না।

বেশ মাথা উঁচু করেই নতুন বউকে নিয়ে বেরোল গোবিন্দ। এক হাতে একখানা স্যুটকেস, অন্য হাতে বউয়ের একখানা ব্যাগ, জ্যাঠার হাতে কিছু দেয়নি তারা। বুড়ো মানুষ, তায় গুরুজন। শুধু নিজের একখানা

পুরনো চটের ব্যাগ ছাড়া। বউ গঙ্গা আর একটা ব্যাগ বইছে। বিয়ে বাবদ পাওনাগণ্ডা আদায় হলে গন্ধমাদন বওয়ার ঝামেলা থাকত। সেদিক দিয়ে বাঁচোয়া। বি পি এল শ্বশুর একখানা শস্তা হাতঘড়ি আর একখানা সাইকেলের দাম মোটে দিয়েছে। আর বরসজ্জায় একখানা প্যারাসুটের কাপড়ের রেডিমেড পাঞ্জাবি আর জ্যালজ্যালে ধুতি।

তোরা রিকশায় ওঠ। আমি হেঁটেই মেরে দেবোখন।

গোবিন্দ বলল, আহা, টিকিটের টাকাটা তো বেঁচেছে। ওতে আপনার ভাড়া হয়ে বেশি, উঠুন তো রিকশায়। আজ অত হিসেব করতে নেই। বিয়ে বলে কথা, তায় আপনি বরকর্তা।

অভ্যেস নেই রে, সেই স্বদেশি আমলে আরাম-বিলাস ছেড়েছি, আজ বাবুয়ানি করা কি ভাল?

আশি টপকালেও হারান জ্যাঠা গায়ে পায়ে পোক্ত লোক। চরণবাবুর ট্যাক্সিতেই সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ান। গোবিন্দ বলল, এ আরাম-বিলাসের ব্যাপার নয় জ্যাঠা। কাল বউভাতের জোগাড়যন্তর আছে। আপনি ছাড়া বাজারহাট করবেটা কে? বুড়ো মা ছাড়া আর কে আছে আমার! সময় নেই মোটে। রিকশায় গেলে বেলাবেলি বিয়ের বাজারটা বুঝে-সুঝে করে আসতে পারবেন।

দূর বোকা! এই তো নাকের ডগায় বাজার। তুই বরং টাকাটা ফেলে দিয়ে চলে যা। আমি বাজার করে ভ্যানগাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। মাছ মাংস তো এবেলা নেওয়া যাবে না, কাল সকালে ফের আসতে হবে।

তো তাই ঠিক হল। গোবিন্দ জ্যাঠার হাতে টাকা দিয়ে রিকশায় উঠল। বউ পাশে নিয়ে রিকশায় চেপে এই যাওয়াটার ফান্ডাই আলাদা।

গঙ্গা ফিসফিস করে বলল, ঢাকনাটা তুলে দাও না, সবাই দেখছে যে!

আহা, দেখুক না শালারা, আজ তো দেখারই দিন। লজ্জা কীসের, পরের বউ তো ভাগিয়ে আনছি না রে বাপু।

গঙ্গা ঘোমটাটা আরও একটু টেনে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

মোবাইলে মিউজিক বাজছিল। ঝিনচাক রিংটোন। মালটা ভালই দিয়েছিলেন মিশ্রবাবু।

বাঁদিকে বউ, ডান হাতে কানে মোবাইল নিয়ে হুডখোলা রিকশায় যেতে গোবিন্দর আজ রাজাগজার মতোই লাগছে।

হ্যালো... হ্যালো...

কে? গোবিন্দ?

হ্যাঁ বউদি।

আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কী বলো তো! আমার ক্যাবিনেটটার কাজ অর্ধেক করে ফেলে রেখে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলে তুমি! মোবাইলে ধরা যাচ্ছে না, আউট অফ রিচ। ব্যাপারটা কী? কত টাকা অ্যাডভান্স নেওয়া হয়ে গেছে খেয়াল আছে?

কালই আসছি বউদি। একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল বলে দুটো দিন দেরি হয়েছে। ভাববেন না এক সপ্তাহে কাজ নামিয়ে দেব।

তোমার কথার কোনও ঠিক আছে? দু'দিনের কাজ তোমার দু'মাস লাগে। এরকম করলে কি আমার চলে? কতবার বলেছি যে, এটা আমার ভীষণ জরুরি কাজ...

ভ্যাজরং ভ্যাজরং ভ্যাজরং চলল কিছুক্ষণ। এসব তার গা-সওয়া, গায়ে মাখতে নেই, ফেলতেও নেই, খদ্দের লক্ষ্মী, দুটো মন্দ কথা কইবে, আবার পকেট ভরেও দেবে। গাল-মন্দ করবে, ফের গোবিন্দকেই ডাকবে। মানুষের স্বভাবই হল পুরোনো কাজের লোক, চেনা লোককে সহজে বদলাতে চায় না। তা ছাড়া গোবিন্দর মতো নিখুঁত কাজটাই বা করবে কে?

পাঁচ মিনিট বাদে ফের ঝিনচাক মিউজিক, আড়চোখে বউয়ের দিকে তাকায় গোবিন্দ। স্বামীর দরটা বুঝতে পারছে কি মেয়েছেলেটা!

হ্যালো, হ্যালো...

গোবিন্দ?

হ্যাঁ, দাদা, বলুন!

আর কী বলব, তুমি একটা হোপলেস...

ফের ভ্যাজরং, ভ্যাজরং...

বাড়ি পৌঁছোতে কুড়ি মিনিটের বেশিই লাগল। তার মধ্যেই গোটা

চারেক ফোন পেয়ে গেল গোবিন্দ। কালকের মচ্ছবটা সেরেই কাজে নামতে হবে। মেলা অর্ডার নিয়ে বসে আছে। সব নামাতে হলে নাওয়া-খাওয়া ভুলতে হবে। বিয়ে বাবদ প্রায় চারটে দিন শিডিউল থেকে খসে গেছে।

বুড়ি মা ডালা-কুলো নিয়ে তৈরিই ছিল, আর পাড়ার যতেক বউ-বাচ্চা-মেয়েরা। খুব একটা হিলিবিলি পড়ে গেল রিকশা থেকে নামতেই। উলু, শাঁখ, চেঁচামেচি আর সেই গণ্ডগোলে বউটা খসে গেল পাশ থেকে। এখন গঙ্গাকে নিয়েই কাড়াকাড়ি টানাটানি চলছে।

গোবিন্দ মালপত্র নিয়ে ধীরেসুস্থে নামল। বিয়ে হল মেয়েদের পরব, পুরুষ গৌণ। তাকে কেউ পুঁছবে না এখন।

জায়গাটা গাঁ-ঘেঁষা। খোয়ার সরু রাস্তা, চারদিকে বন-বাদাড়, বেশির ভাগই টিনের ঘর, তার মধ্যে গোবিন্দর বাড়িখানারই যা একটু শ্রী আছে। তা বলে দালান-কোঠা নয়, তবে পাকা ঘর, চালে টিন। সামনের বছর ছাদ ঢালাই হয়ে যাবে।

বর্ষাকালে বড্ড ভ্যাপসা গরম হয়। তার ওপর উঠোন জুড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ফলে হাওয়া চলাচল বন্ধ। ঘরে ঢুকে গায়ের সিনথেটিক চকচকে পাঞ্জাবিটা আর তলার গেঞ্জিটা ছেড়ে লুঙ্গি পরে বাঁচল গোবিন্দ। পাখার নীচে বসতেই মনে হল, দার্জিলিং।

সোঁদরবনের বাদা এলাকা থেকে এসে বউটা তার ঘরদোর দেখে খুশি হচ্ছে তো! হওয়ারই কথা।

ফের ঝিনচাক মিউজিক, মোবাইলের এই রিংটোন হল মা লক্ষ্মীর পায়ের নূপুরের বোল। যত ফোন তত কাজ, আর যত কাজ তত টাকা। বাজারে ভাল জাতের ছুতোর মিস্ত্রির আজকাল খুব আকাল। একটু আর্টের কাজ জানা লোক পাওয়াই যায় না। বেশির ভাগই আনাড়ি মিস্ত্রি, একটু ঠুকঠাক শিখেই কাজে নেমে পড়ে এবং দু'নম্বরি কামানোর চেষ্টা করে। গোবিন্দ ও পথ মাড়ায় না। সে কাজ শিখেছিল তার বাবার কাছে, তারপর ওস্তাদের ওস্তাদ অক্ষয় মিস্ত্রির কাছে।

হ্যালো।

মিশ্রবাবু বলছি।

হ্যাঁ স্যার, বলুন।

তুমি তো বিয়ে করতে গিয়েছিলে!

হ্যাঁ স্যার, ওই কোনওরকম নমো নমো করে। আমাদের আবার বিয়ে!

কেন, তোমার বিয়েটা বিয়ে নয় কেন?

আজ্ঞে স্যার, গরিবদের তো ঠিক সেরকম নয়, নামমাত্র ব্যাপার।

তা হোক। সব মিটে গেছে তো!

হ্যাঁ স্যার।

বউ কেমন হল? পছন্দ?

কী যে বলেন স্যার! আমাদের সব মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। সোঁদরবনের মেয়ে, কত আর হবে বলুন। গরিব ঘর।

তোমাকে গরিব-রোগ পেয়েছে দেখছি! অত গরিব গরিব করো কেন? তুমি কি আর তত গরিব?

স্যার, মাল মেটেরিয়ালের দাম কী হারে বাড়ছে বলুন। এরপর আর কেউ কাঠের কাজ করাবে? সব ওই স্টিল আর প্লাস্টিকের দিকে ঝুঁকছে।

দেখ গোবিন্দ কাঁদুনি গেয়ে লাভ নেই। তোমার যে দু'হাতে রোজগার হয় তা আমি জানি।

স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু হাতে কিছু থাকে না তেমন। ছুটকো ছাটকা কাজে মার্জিন রাখা মুশকিল, একটা বড়সড় কন্ট্রাক্ট পেলে কিছু হত।

আমি তোমাকে একটা বড় কাজের কথা বলার জন্যই 'ফোন করছি। একটা অফিসের পুরো প্যানেলিং, ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট মেটেরিয়াল দিয়ে করতে হবে। পারবে?

নতুন বউটা কি তাহলে পয়মন্ত? অ্যাঁ! বুকটা ধক করে উঠল গোবিন্দর। তাড়াতাড়ি বলল, খুব পারব স্যার। কত টাকার কাজ?

তা বেশ কয়েক লাখ টাকার হবে।

টেন্ডারের ব্যাপার নেই তো!

না। তবে এস্টেট ম্যানেজার কথা বলে দেখবেন তুমি এক্সপেরিয়েন্সড কিনা।

আমি কালই যাচ্ছি স্যার।

আরে না, তাড়াহুড়ো নেই। বিয়ের অনুষ্ঠান মিটুক। হানিমুন থেকে ঘুরে এসে দেখা করলেও হবে।

কী যে বলেন স্যার! হাঁড়ি সামলাতেই প্রাণান্ত তো হানিমুন! যেদিন বলবেন গিয়ে হাজির হয়ে যাব।

কাজ খারাপ হলে কিন্তু আমার বদনাম হবে, মনে রেখো।

কখনও কাজে গলতি পেয়েছেন স্যার?

আর শোনো, এটা টাইম-বাউন্ড কাজ। সময়মতো শেষ না হলে পেমেন্ট ঝুলে থাকবে।

অফিসের কাজ কিছু করেছি স্যার। ঠিক সময়মতো তুলে দেব।

ঠিক আছে।

স্যার, একটা কথা।

কী?

আপনার সাত বাই সাত খাটটার কাঠ পেয়েছি।

কোথায় পেলে?

মল্লিকপুরে একটা বাড়িতে দুটো বিম পাওয়া যাচ্ছে। দুটোই বার্মা সেগুনের। অন্তত একশ বছরের পুরোনো, ঝুন কাঠ। দাম একটু চড়া আছে।

ছেড়ে দাও। আমার লাগবে না।

কেন স্যার? এই চান্স মিস করলে ফের কবে পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই।

আমার লাগবে না। ছেড়ে দাও।

স্যার, খাট যদি নাও বানান, তবু বিম দুটো কিনে রেখে দিন। দু'দিন পর বেচে দিলেও অনেক প্রফিট থাকবে।

দেখ গোবিন্দ, আমি ব্যবসাদার নই, কাঠের মিস্ত্রিও নই। এসব তুমি বোঝো গিয়ে। আমার দরকার নেই।

BanglaBook.org

হাওয়া গরম বুঝে গোবিন্দ গলা নরম করে বলল, ঠিক আছে স্যার, ছেড়েই দিচ্ছি।

হ্যাঁ ছেড়ে দাও।

ফোন কেটে দিল মিশ্রবাবু। হাওয়া গরম তো বটেই, হাওয়াটা উলটোও, হাওয়া বুঝে চলতে জানে বলেই নানান রকম চিড়িয়াকে চড়িয়ে খাচ্ছে গোবিন্দ। শুধু কাজ জানলেই হয় না, মানুষের মেজাজ-মরজিও জানতে হয়। অন্য কেউ হলে চাপাচাপি করত, জবরদস্তি করত। ওইতেই সুতো কেটে ঘুড়ি ভো-কাট্টা হয়ে যায়।

না, তার বউটা পয়মন্তই বটে, ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় অর্ডার এসে হাজির। টুয়েন্টি পারসেন্ট মার্জিন রাখতে পারলে পর্বত হয়ে যাবে।

উঠে একটু ভিতর বাড়িতে উঁকিঝুঁকি দিল গোবিন্দ। না, কোনও চান্স নেই। পাকা কাঁঠালে মাছির মতো বউটাকে ছেঁকে ধরেছে পাড়ার যত বউ-ঝি-আইবুড়ো মেয়ে-বাচ্চার দল। কী এত দেখছে কে জানে! বাপ তো দেখার মতো শাড়ি-গয়না দেয়নি। এ সময়ে একা পেলে একটু ভাল হত। কপাৎ করে বউটাকে একটা চুমু খেত সে।

বসে থাকার উপায় নেই। এখনও মেঘে ঢাকা থম ধরা আকাশে রোদের আভাস আছে। ঘড়িতে মোটে বেলা সাড়ে তিনটে, কাজও মেলা। কাল বউ-ভাত। অন্তত একশো দেড়শো লোক খাবে। ইলেকট্রিশিয়ান কাজ করছে, ডেকোরেটরও বহাল রয়েছে, তবু দেখাশুনোর ব্যাপার আছে। রান্নার ঠাকুর, কলাপাতা, ভাঁড় আরও অনেক কিছু। গোবিন্দ গায়ে গেঞ্জি চড়িয়ে লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

BanglaBook.org

আমার ট্র্যাজেডিটা কী জানেন? যে-কথাটা আপনাকে বলার জন্য আমার স্ত্রী তাড়না করে আমাকে আপনার কাছে পাঠান সে কথাটা আমি কোনও দিন আপনাকে বলতে পারব না।

কেন বলুন তো!

বলাটা উচিত হবে না বলে। কথারও একটা ক্রম আছে, আগু-পিছু আছে, সিচুয়েশন আছে, কথাটা অনিবার্য কিনা, কখন সেটা সবচেয়ে বেশি অভিঘাত সৃষ্টি করবে বা অমোঘ হয়ে দাঁড়াবে তারও একটা বিচার আছে।

দূর মশাই, অত ভেবেচিন্তে কি কেউ কথা কইতে পারে?

না পারে না। আর তাইতেই তো কথা শস্তা হয়ে গেল, কথার ইনফ্লেশন এমন জায়গায় পৌঁছে গেল যে তার ক্রয়যোগ্যতা গেল কমে, দুই গলাগলি বন্ধু একজন আর একজনকে শুয়োরের বাচ্চা বলে আদর করছে, শুনেছেন কখনও?

না, আমি শুনিনি।

আমি শুনেছি, প্রায়ই শুনি। রেগে গিয়ে অপমান করার জন্য বলে সে একরকম, আবার ভালবেসেও বলে সে আর একরকম। ফলে ওই শুয়োরের বাচ্চা শব্দটাই গোলমালে পড়ে গেল। ডেবিটের ঘরেও বসছে, ক্রেডিটের ঘরেও বসছে, ফলে তার মূল্যমান নেমে শূন্যে গিয়ে ঠেকল। বুঝলেন কি?

একটু একটু। আপনি কি বাক্যবিরোধী মানুষ?

আরে না না, আমি বাক্য ব্যবহারের পক্ষেই তো বলছি। বাক্যকে ঠিক মতো ব্যবহার করা, যথাযোগ্যভাবে।

বাক্যকে কী ভাবে ব্যবহার করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আমি সেই সূত্রটাই বহু দিন ধরে খুঁজছি। আর এই সূত্র সন্ধানে ঘুরে ঘুরে আমি নানা ঘটনা, বিবাদ বিসংবাদ, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া যেখানে যা হয় সব মন দিয়ে শুনি এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

এমন কী পাড়ার রকে যে ছোকরারা আড্ডা দেয় আমি তাদের কাছাকাছি গিয়েও চুপ করে বসে বুঝবার চেষ্টা করি তারা বাক্যকে, ভাষাকে, শব্দকে কত ভাবে, কোন অনুষঙ্গে কতখানি ওজন দিয়ে বলছে। যে কোনও আড্ডায় আমি অনাহূত, রবাহূত হয়ে যাই, মিটিং শুনি, স্লোগান শুনি, এমনকী রেডলাইট এলাকার ভিতর দিয়েও খুব আস্তে আস্তে হেঁটে যাই নানা বাক্য বা বাক্যাংশ কুড়িয়ে নিয়ে যাচাই করার জন্য।

কখনও বিপদে পড়েন না?

তাও পড়তে হয়, এই তো কয়েক বছর আগে একটা সাইকেল সারাইয়ের দোকানে ঝগড়া হচ্ছে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঝগড়া শুনতে দোকানের সামনে কিছু লোকও জুটেছে। বোঝা গেল ঝগড়া লেগেছে দুই ভাইয়ে। বড় ভাই মাতাল হয়ে এসে ছোট ভাইকে অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে। মাতালদের কথা শুনেছেন তো! আগল থাকে না বলে হুড়গুড় করে বমির মতোই কথা বেরিয়ে আসে, যাতে পরম্পরা বা লজিক থাকে না। ছোট ভাইটা একটা ভারী রেঞ্চ দিয়ে সাইকেলের চাকা মেরামত করছিল। সে একটাও কথা কইছে না। গুম হয়ে বসে কাজ করে যাচ্ছে। উলটে কিছু বলছে না। এই বাক্যহীন আচরণ আমার ভাল লাগছিল না। হঠাৎই ছোট ভাইটা নিঃশব্দে উঠে হাতের ভারী রেঞ্চটা দিয়ে বড় ভাইয়ের মাথার পিছনে উপর্যুপরি মারতে লাগল। আর তখন নারকোল ফাটানোর মতো আওয়াজ হচ্ছিল।

থাক, থাক, আর বলবেন না, প্লিজ!

থাক। সামান্য হেড ইনজুরিতেই ডাক্তাররা গম্ভীর হয়ে ওঠে, আর এ তো—যাকগে যাক। বলছিলাম, কথারও একটা দৃশ্যমানতা আছে! এই যেমন ঘটনার বিবরণ শুনে দৃশ্যটা আপনার চোখের সামনে সত্য হয়ে উঠল, আপনি রিঅ্যাক্ট করলেন এবং আমাকে থামতে বললেন। এইখানেই বাক্যের জোর, তার দৃশ্যমানতা।

এবার আপনি কঠিন হয়ে গেলেন।

ব্যাপারটাই কঠিন। বড়ই কঠিন। লক্ষ লক্ষ বাক্য, লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ দৃশ্যমানতা। কাকে বাছি, কাকে রাখি! আমি আমার স্ত্রীকে তাই বলছিলাম, আপনি আমাকে যে প্রস্তাব দিয়ে পাঠাচ্ছেন তা আমার পক্ষে উত্থাপন করা অতিশয় কঠিন। আমাকে এ ভার দেবেন না। আমি বাকপটু নই, বাক্য ব্যবহারে আমার নানা দ্বন্দ্ব আছে।

BanglaBook.org

আপনি কি স্ত্রীকে আপনি আজ্ঞে করেন?

অবশ্যই। আমি আমার স্ত্রী বা পুত্র কন্যা, বাড়ির কাজের লোক সবাইকেই আপনি সম্বোধন করি।

তাঁরা রাগ করেন না?

স্ত্রী প্রথম প্রথম রাগ করতেন, পরে সয়ে গেছে। পুত্র কন্যারা জন্মাবধি শুনে আসছে বলে রাগ করে না, তবে ইদানীং বন্ধুবান্ধব বা বাইরের লোকজনের সামনে তারা কিছু অস্বস্তি বোধ করে। পারতপক্ষে আমার কাছে ঘেঁষে না।

এতে কি আপনার কিছু সুবিধে হয়?

বিস্তর, বিস্তর। ওই আপনি-আজ্ঞের সুবাদে তাদের সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব রচিত হয়। পুত্রদের আমি অমুকবাবু তমুকবাবু এবং স্ত্রী ও কন্যাদের অমুকদেবী তমুকদেবী বলে সম্বোধন করায় তারা কখনও আমার সঙ্গে মাখামাখি করে উঠতে পারেনি।

দূরত্ব কি ভাল?

আমার তো মনে হয়, অতি ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ককে ভারী তরল করে দেয়। পরস্পরকে মাপজোক করা যায় না। দূরত্ব থাকলে একটা অ্যাসেসমেন্ট করা যায়। মুখের খুব কাছে আয়না ধরলে কি মুখশ্রী ঠিক মতো দেখা যায়? একটা অপটিমাম দূরত্ব না রাখলে—

বুঝেছি, আপনি কঠিন মানুষ।

না, কঠিন নয়। আত্মরক্ষার্থে প্রাচীন দুর্গের মতো আমি নিজের চারদিকে একটা পরিখা খনন করেছি মাত্র।

স্বখাত সলিলে ডুবে মরার ভয় নেই তো!

আছে। খুবই আছে। দুর্গাধিপতির শুধু পরিখাই থাকে না, তার

সৈন্যসামন্ত থাকে, তির-ধনুক-কামান-বন্দুক থাকে, অর্থাৎ সে প্রতিরোধ এবং প্রতি আক্রমণও করতে পারে। আমার মুশকিল হল, কেউ আমার পরিখা ডিঙিয়ে এলে আমার কোনও সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স নেই। কাজেই দূরত্ব রচনাই বড় কথা নয়। শক্তিশালী মানুষ হলে সে আমার পরিখাতেই আমাকে ডুবিয়ে মারবে। আজকাল সেরকম একটা লক্ষণ প্রায় দেখতে পাচ্ছি।

সেটা কী রকম?

এই যেমন, দূরত্ব রচনার ফলে আমি ঘরের মধ্যেই খানিকটা একলা হয়ে গেছি। কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না, কোনও ব্যাপারে আমার মত নেয় না এবং আমার নাকের ডগাতেই নানা অনভিপ্রেত কাজ করে। সংসারে আমার গুরুত্ব নেই। শুধু তাই নয়, আমাকে দিয়েই নানারকম অপছন্দের কাজ করায়। এই আপনার কাছে প্রেরিত হওয়াটা যেমন।

আমার কাছে আসাটা যে আপনি বিশেষ পছন্দ করেন না তা বেশ বুঝতে পারছি।

আজ্ঞে ঠিক উলটো, আপনি অতি ভদ্র সজ্জন মানুষ। মোটা বেতনের চাকরি করেন। নিজ বাড়ি, নিজ গাড়ি, স্বাবলম্বী। আপনার কাছে এলেই একটা শিক্ষা লাভ হয়। কিন্তু মানুষকে বিব্রত ও বিরক্ত করাটা সামাজিক অপরাধ।

আমি মোটেই বিরক্ত হচ্ছি না। বরং আপনার সঙ্গে কথা বললে আমারই একটা শিক্ষা লাভ হয়। আপনি একটু অন্যরকম মানুষ।

বিধাতা বলে যদি কেউ সত্যিই থেকে থাকেন তবে বলতে হবে, তিনি একেবারেই সাম্যবাদী নন। তাঁর সৃষ্টিতে রকমারি থাকবেই। সকলের জন্য একঢালা বন্দোবস্ত তিনি পছন্দ করেন না। বৈচিত্র্যই তাঁর বৈশিষ্ট্য। আমিও তাঁর বৈচিত্র্যেরই এক প্রকাশ। লোকে আমাকে পাগলও বলে, আপনিও সেরকম মনে করেন কিনা তা জানি না।

অল্পবিস্তর পাগল আমরা সকলেই। পাগল না বলে বায়ুগ্রস্ত বললে

অনেকটা ঠিক হয়। না, আপনাকে আমার পাগল বলে কখনও মনে হয়নি।

সৌজন্য এক দায়। সৌজন্য প্রচলিত আছে বলেই মানুষ মনের কথা কখনও খুলে বলতে পারে না। আপনার বোধহয় স্নানাহারের সময় হয়েছে। এবার আমি আসি।

আমার স্নান সকালেই হয়ে যায়। আহারেরও কিছু ঠিক নেই। দুপুরে হয়তো বেরিয়ে গিয়ে বাইরে কিছু খেয়ে নেব। ছুটির দিনটা আমি বেশি ঝামেলা করি না।

একা থাকার আনন্দই আলাদা। কী অবারিত স্বাধীনতা। তবে আপনার বিবাহের একটা উদ্যোগ চলছে বলে আমার স্ত্রী বলছিলেন। মেয়েরা অন্যের খবর খুব কৌশলে সংগ্রহ করেন। তিনিই বলছিলেন মেয়েটি অতীব সুন্দরী।

আপনি স্বাধীনতার কথাও বলছিলেন। আপনি বিবাহিত লোক। বলুন তো, কোন জীবনটা ভাল।

পাল্লাটা ওঠা-নামা করে, কখনও স্থির হয় না। বিবাহিত জীবন অবারিত নয় বটে, তবে অভিজ্ঞতা হয়, বস্তুজ্ঞান বাড়ে, এবং পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের কঠিনতম বিষয়টির অধ্যয়নের অধিকার বিবাহিত না হলে অর্জনই করা যায় না।

তাই নাকি? তা বিষয়টা কী?

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম।

ওটা একটা ক্লিশে। আমার তো মনে হয় পুরুষের চরিত্রও কম জটিল এবং আনপ্রেডিকটেবল নয়।

নানা মুনির নানা মত। তবে আপনার কথাটাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। পৃথিবীর বাইরে যত অশান্তি, যত যুদ্ধবিগ্রহ হিংসা, টেরোরিজম, গুপ্তহত্যা, গ্লোব ওয়ার্মিং, ডিফরেস্টেশন, নেশাভাঙ, চোরাই চালান, চুরি-ডাকাতি-খুন, রাজনীতি এবং দূষণ ইত্যাদির মূলে পুরুষ। আর সংসারের ভিতরকার যত অশান্তি, লাগানি-ভাঙানি, বধূ-নির্যাতন, স্বার্থপরতা, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র, ঝগড়া-বিবাদ, এ সবের মূলে

হল মেয়েমানুষ। আপনার কি মনে হয় না যে, নারী ও পুরুষ দু'জনেই দু'ভাবে এই পৃথিবীকে ক্রমান্বয়ে উৎপীড়ন করে যাচ্ছে!

হ্যাঁ, মনে হয়। এখন মনে হচ্ছে।

আপনি যে আমার সব কথায় সায় দিচ্ছেন, এটা শুভ লক্ষণ নয়। আমরা যাকে গুরুত্ব দিই না তার সব কথায় সায় দিয়ে তাকে এড়ানোর চেষ্টা করি।

তা নয়। আপনার কথায় আমার চিন্তার কিছু প্রতিফলন আছে বলেই সায় দিচ্ছি।

আচ্ছা, কাল রাতে কি আপনি ফ্ল্যাটে ছিলেন না?

কেন বলুন তো!

আপনি ভাগ্যবান মানুষ। এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকেন, তার ওপর ঢাকুরিয়ায় পৈতৃক বাড়ি। আপনার রাত্রিবাসের তো একাধিক জায়গা। আপনি তো আর আমাদের মতো নন যে, ছোট ফ্ল্যাটে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হবে। কোনও অলটারনেটিভ নেই।

অলটারনেটিভের সুবিধে কী?

এই একটু হাওয়া-বদল হয়, একঘেয়েমি কাটে। কাল রাতে তাহলে আপনি একটু হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলেন?

কেন কিছু হয়েছে নাকি?

না তেমন কিছু নয়। গতকাল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনার খোঁজে একজন এসেছিল। আপনার বিটোফেন মার্কা ডোরবেলটা উলটোদিকে আমাদের ফ্ল্যাট থেকেও শোনা যায় কিনা।

ওটা বিটোফেন নয়, বাখ।

আমাদের কাছে সবই সমান। যাঁহা বিটোফেন তাঁহা বাখ, অন্ধের আবার দিবারাত্রি। তবে বলতেই হবে আপনি শৌখিন মানুষ। ডোরবেলটা বোধহয় বিদেশ থেকে আনানো, তাই না?

হ্যাঁ।

তা ছোকরা বেশ অনেকবার ডোরবেলটা বাজাল। বোধহয় জরুরি কাজ ছিল আপনার সঙ্গে।

কীরকম চেহারা বলুন তো!

কোনও কোনও চেহারা আছে যা অ্যাপারেন্টলি ভয়ংকর নয়, তবে তাদের দেখলে একটু ভয় ভয় করে। এই ছেলেটাও তেমনি। বেশ অনেকটা লম্বা, হাড়েমাসে শরীর, চোখ দুখানা খুব পেনিট্রেটিং।

ওঃ ও আমার ভাই গোরা।

ভাই! কিন্তু ভাই হলে তো চেহারার মিল থাকবে। আপনি যেমন অতীব ফরসা এবং সুপুরুষ এবং একটু কমনীয় ভাব আছে, ইনি তেমন নন। একটু যেন রাফ-টাফ গোছের।

ভয় পেয়েছিলেন নাকি?

অনেকবার ডোরবেল বাজছে দেখে স্পাই হোল দিয়ে একটু লক্ষ করলাম। মশাই আজকাল লোকের হাবভাব দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। দিনকালও ভাল নয়, বহুতলে চোর-ডাকাত-খুনি দেদার ঢুকে পড়ছে। একে দেখলাম একটু ধৈর্যহারা ভাব, যেন একটা হেস্তনেস্ত করতে এসেছে। বেশ মারমুখো চেহারা, সত্যি বলতে কি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মিনিট দশেক বার বার বেল টিপছিল। তারপরেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে চলে গেল। ফের এল দশটার সময়। আবার সেই বিটোফেন বা বাখ যাহোক শুনে গিয়ে ফের স্পাই হোল দিয়ে দেখি সেই ছেলেটাই। এবার ভাব-সাব আরও যেন অ্যাগ্রেসিভ। আমি তো ভাবলাম আপনাকে খুন-টুনই করতে এসেছে হয়তো। বলা তো যায় না, আজকাল কে যে কার ওপর কেন বদলা নেয় কে জানে!

গোরা আমার খুড়তুতো ভাই। ভাইয়ের চেয়েও বেশি বন্ধু।

আপনার এরকম বিপজ্জনক ভাই আর ক'জন আছে?

তার মানে?

বৃত্তান্ত এখনও শেষ হয়নি, রাত দশটায় উনি আপনার ডোরবেল বাজিয়ে আপনাকে না পেয়ে আমাদের ওপর এসে হামলে পড়লেন। দরজা খুলতেই ভ্রুকুটি করে বললেন, মৃণাল মিশ্রকে চেনেন? বললাম, হ্যাঁ, চিনি। উনি বেশ কড়া গলায় ধমকের সুরে বললেন,

কখন ফেরে? আমি ভড়কে গিয়ে বললাম, রোজ তো সন্ধেবেলাতেই ফেরেন, আজ বোধহয় দেরি হচ্ছে। উনি খুব জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঘুরে সাঁ করে চলে গেলেন। ফের এলেন রাত বারোটায়। আমাদের দারোয়ান বা সিকিউরিটি তাকে কেন আটকায়নি কে জানে। হয়তো সাহস পায়নি, কিংবা উনি হয়তো চোরা পথে ঢুকেছিলেন, কিন্তু ঢুকেছিলেন ঠিকই। আজ সকালে দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করে কোনও সদুত্তর পাইনি। ওরা মিনমিন করে বলল, রাত বারোটায় ওরা কোনও অচেনা লোককে ঢুকতে দেখেনি। খুবই রহস্যময় ব্যাপার। তাই না? কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব একটা অবাক হননি!

রাত বারোটায় আপনি জেগেছিলেন নাকি? আপনি তো আরলি স্লিপার আর আরলি রাইজার।

সে ঠিক। তবে গতকাল রাতে আমার ঘুম আসছিল না। আর আমি আরলি ঘুমোলেও আমার বাড়ির সবাই জেগে থাকে। ওরা টিভি দেখে। লেট নাইট সিনেমা-টিনেমা থাকে বোধহয় টিভিতে। আজকাল তো চ্যানেলগুলো চব্বিশ ঘন্টাই খোলা। রাত বারোটায় আপনার ডোরবেলের বাখ বা বিটোফেন শুনে আমার স্ত্রী আমাকে ডেকে তোলেন। আর আমি গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ফের সেই মূর্তিমান। চুল উশকো খুশকো, চোখ ঝলসাচ্ছে এবং বেশ অ্যাগ্রেসিভ চেহারা। আমি ভেবেছিলাম জানালা দিয়ে দারোয়ানদের ডাকি। কিন্তু রাত বিরেতে তিনতলা থেকে চেঁচামেচি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। যাই হোক উনি কিছুক্ষণ পর চলে যান। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হ্যাঁ, মশাই, এই ভাইটির সঙ্গে আপনার খাড়াখাড়ি নেই তো!

না। ও আমার বন্ধুই শুধু নয়, এ সুপার্ব ম্যান। আমাকে সেই ছেলেবেলা থেকে প্রোটেকশন দিয়ে আসছে। আমার কোনও বিপদ হলেই গোরা আমাকে আড়াল করে দাঁড়াত। একবার পুজো দেখতে গিয়ে আমি ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। চারদিককার বড় বড় মানুষের চাপে পড়ে দম বন্ধ হয়ে যাই যাই অবস্থা। শুধু একবার

চিৎকার করেছিলাম, গোরা, আমি মরে যাচ্ছি... কোথা থেকে ওই ভয়ংকর ভিড়ের মধ্যে গোরা এসে আমার হাত ধরে লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুড়ে বের করে এনেছিল কে জানে। তখন ওরও তো মাত্র বারো-তেরো বছর বয়স। ফুটবল মাঠে দু'জনে যখন এক টিমে খেলতাম তখন গোরা বরাবর নিজে গোল না দিয়ে আমাকে দিয়ে গোল করানোর চেষ্টা করত। খেলাধুলোয় আমি ভাল ছিলাম না। ও ছিল দুর্দান্ত। কাটিয়ে-টাটিয়ে আমার পায়ে বল এগিয়ে দিত গোলে শট নেওয়ার জন্য। আমি ভাল রেজাল্ট করতাম, গোরা করত না। কিন্তু কোথাও জেলাসি ছিল না ওর। বরাবর আমাকে আগলে রেখেছে। এবং দুঃখের বিষয়, আজও রাখে।

দুঃখের বিষয় কেন মশাই?

আমাকে গোরা সাবালক হতে দিচ্ছে না। এখনও নানাভাবে আমার পায়ে বল এগিয়ে দিচ্ছে। আমি এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কটা শেষ করতে চাই।

চার

দিদিমণি আমি গোবিন্দ।

কে গোবিন্দ?

গোবিন্দ মিস্ত্রি। কার্পেন্টার।

ও হ্যাঁ! কিছু বলবে?

স্যার তো খাটটা করাতে চাইছেন না। আমার ডিজাইনটা আপনি পছন্দ করেছিলেন। মনে আছে? ডেকোরেটিভ হেডবোর্ড, সঙ্গে বুককেস।

হ্যাঁ, মনে আছে।

দুটো বার্মা সেগুনের বড় বিম পেয়ে গেছি। খাটটা তো হবেই, সঙ্গে ডাইনিং টেবিল আর একটা আলমারির কাঠও বেরিয়ে যাবে। স্যারের

কাজ তো পয়সার জন্য করছি না। একটা আর্টের কাজ। একশো বছর গ্যারান্টি থাকবে।

একশো বছর পর তুমিও থাকবে না, আমিও থাকব না। গ্যারান্টির কী দাম আছে?

আমরা থাকব না, কিন্তু জিনিস তো থাকবে। লোকে দেখে বলবে, হ্যাঁ, মাল একখানা বানিয়েছিল বটে এক মিস্ত্রি।

এ সব কথা তোমার স্যারকে বলো, আমাকে কেন?

পুরুষ মানুষরা তো মেয়েমানুষেরই বশ। আপনি বুঝিয়ে বলুন না। কাঠটা যখন অনেক মাথা খুঁড়ে পেয়েছি তখন না হয় বিনা মজুরিতে করে দেব। এ কাঠে কাজ করার আনন্দই আলাদা।

ওঃ, তুমি তো রিসেন্টলি বিয়ে করেছ, তাই না?

ও বাদ দিন। করতে হয় তাই করা। মা বুড়ি হয়ে গেছে। ঘরদোর কে সামাল দেয় বলুন, কে রাঁধে বাড়ে, মাকে দেখে রাখে! আমি তো চৌপর দিন কাজের জায়গায় পড়ে থাকি।

বিয়ে করে কাজের মেয়ে আনলে বুঝি? বিয়ে মানে কি শুধু কাজ?

দিদিমণি কী যে বলেন! গায়ে গতরে না খাটলে কি সংসার দাঁড়ায়? এক মুঠো ভাতেরও হিসেব রাখতে হয় যে!

পুরুষ মানুষরা কোনও দিন মানুষ হবে না। বুঝেছ? নতুন বউকে খুব খাটিয়ে মারছ তো?

না, আমি খাটাব কেন? সে নিজেই খাটে। দশভুজা হয়ে ঘরদোর মেজে ঘষে সাফ করছে। ডগমগ করছে খুশিতে। একদিন আসবেন দেখতে? সোনারপুর তো কাছেই।

কী দেখব বলো তো! একটা মেয়েকে নাকে দড়ি পরিয়ে সংসারের ঘানিতে ঘোরাচ্ছ, তাই? ছিঃ ছিঃ!

ওরে ব্বাস রে! তার নাকে দড়ি পরাবে কে? দিদিমণি নিজের সংসারের স্বাদ পেলে মেয়েরা আপনি খাটে, খাটাতে হয় না।

তোমাকে বলেছে! যাও, বউটাকে নিয়ে কয়েক দিন একটু ঘুরেটুরে এসো। নতুন বউকে একটু তোয়াজ করতে হয়।

একদিন কালীঘাট আর একদিন তারকেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছি। তাও জোর করে। কেবল ঘরের দিকে মন যে!

তাহলে বউ পছন্দ হয়েছে বলো।

আজ্ঞে আছে একরকম, কিছু খারাপ নয়।

তোমাদের ডিভোর্স হয় না?

উরে ব্বাস রে! মামলা-মোকদ্দমায় কে যায় দিদিমণি? ওসব নেই। তবে পুরুষটা মদ-টদ বেশি খেলে আর কিলোলে অনেক সময়ে ভেগে যায়। নইলে থাকে। ছাড়ান কাটান হয় না।

তুমি বউকে কিলোবে না তো! বউয়ের কাছে তো তোমরা বীরপুরুষ।

কী যে বলেন দিদিমণি। এমনি এমনি কেউ মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলে?

খুব তোলে। আমাদের কাজের মেয়ে বাসন্তীকে তো কাল রাতেও ওর বর মেরে চোখ নাক ফুলিয়ে দিয়েছে। ভাত দিতে নাকি দেরি হয়েছিল।

ওই একটা ব্যাপার আছে দিদিমণি। খেটে-খাওয়া লোকগুলো খিদে পেলে বড় গরম হয়ে যায়। ঝাঁ ঝাঁ খিদে নিয়ে বাড়ি ফিরে যদি দেখে রান্নার জোগাড় নেই তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

বাঃ, বেশ তো! খিদে পেলেই বুঝি বউকে পেটাতে হয়? এ আবার কোন দেশি নিয়ম?

আজ্ঞে, আমাদের মতো মানুষদের কথা আর বলবেন না। নিচুতলার মানুষ তো আমরা, সারাদিন লাথি-ঝাঁটা খেয়ে রোজগার করতে হয়, কেউ ভাল মুখে কথা কয় না, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমাদের নিত্যিকার গা-সওয়া ব্যাপার। তাই থেকে ভিতরে ভিতরে বিষ জমে যায় তো। বউ ছাড়া কার ওপর বিষ ঝাড়বে বলুন।

আর বউয়ের বুঝি বিষ জমে না! সে কি তার বরকে পেটায়?

না, তবে বাক্যিতে বিষ ঝাড়ে। ছেড়ে দিন দিদিমণি, আমরা তো আর ভদ্রলোক নই। আমাদের জগৎটাই আলাদা।

যদি বউকে পিটিয়েছ বলে খবর পাই তাহলে কিন্তু তোমাকে পুলিশে দেব।

না না দিদিমণি, আমার বউ খুব লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। সে এসে অবধি আমার ভালই হয়েছে।

ওসব বুঝি না। লক্ষ্মীমন্ত হোক বা না হোক, তাকে শাসন করার অধিকার তোমার নেই।

সে তো বটেই।

এবার কী বলবে বলো।

আজ্ঞে সেই বার্মা সেগুনের কথা। একশো বছরের পুরনো ঝুন কাঠ। হাতছাড়া হয়ে গেলে এ বাজারে এত শস্তায় আর পাওয়া যাবে না। স্যারকে বলতে গেলুম, কিন্তু স্যার গরম হয়ে গেলেন। মনে হয় মেজাজটা বিগড়ে আছে।

আমি কী করব?

যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। আপনাদের বিয়েরই খাট তো। দু'জনে মিলেই ডিজাইন পছন্দ করলেন, মনে নেই? সেই থেকে হন্যে হয়ে কাঠ খুঁজেছি।

একশো বছরের পুরনো কাঠ! এ মা, পুরনো কাঠ দিয়ে বানাবে কেন? পুরনো জিনিস মানে তো পচা।

এ কাঠ যত পুরনো হবে তত দাম।

কী জানি বাবা, পুরনো শুনলেই মনে হয় সেকেন্ড হ্যান্ড, ঠিক আছে, তোমার স্যারকে বলে দেখব।

গোরাবাবু কলকাতায় থাকলে প্রবলেম হত না। গোরাবাবু বললেই স্যার সব মেনে নেন। কিন্তু উনি রানিগঞ্জে চলে যাওয়ায় গণ্ডগোল হয়েছে।

তোমার গোরাবাবু কলকাতাতেই আছে।

আছে! মোবাইলে পাব?

দেখ চেষ্টা করে।

এই সব ভদ্রলোক শালাশালিদের মনের মধ্যে যত জিলিপির

প্যাঁচ। শালারা সোজা ব্যাপারটা সহজ করে বুঝতে চায় না, গোবিন্দর বউ নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কীসের রে মাগি? বউটা তো গোবিন্দর, তোর তো নয়। কিলোও কিনা, কিলোবে কিনা, পুলিশ পাঠাবো—ইঃ শালি, মাল তোর বাপের? সোঁদরবনের কোন তেপান্তর পেরিয়ে জলকাদা ভেঙে বিয়ে করে আনল গোবিন্দ, আর যত মাথাব্যথা হল তোর? এসব ঘর-ভাঙানি মেয়েছেলেকে বিছুটি পাতা লাগাতে হয়।

ফোনটা বন্ধ করে নিজের গরম মাথাটা ঠান্ডা করতে একটু সময় নিল গোবিন্দ। মৃণালবাবুর সঙ্গে বিটুদিদির বিয়েটা কেঁচে যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছে না সে। ইদানীং দু'জনে একটু কেমন যেন হচ্ছে। শুকনো মুখ করে বসে থাকে। আগের মতো হাসিখুশি ভাবখানা যেন নেই আর।

মৃণালবাবুর নতুন ফ্ল্যাটটা সাজিয়েছে গোবিন্দই। শনি-রবি দুটো ছুটির দিনে বিটু দিদিমণি সকাল থেকে চলে আসত আর দু'জনে মিলে গোবিন্দর কাজে খরবদারি করত। শোওয়ার ঘরে দেয়ালজোড়া ওয়ার্ডরোব, স্টাডি রুমে বিশাল মাল্টিপারপাস একজিকিউটিভ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, কমপিউটারের খোপ, রকিং চেয়ার, ডেকোরেটিভ দরজা সব, অতি যত্নে করেছে গোবিন্দ। দু'জনে ভারী খুশি তার কাজ দেখে। তবে ইদানীং কিছু একটা হয়েছে ভিতরে ভিতরে।

আরে বাবা, মনের মধ্যে যত প্যাঁচ কষবে প্রেমের তত কোষ্ঠকাঠিন্য হবে। এর জন্যই বিয়েটিয়ে বেশি ঝুলিয়ে রাখতে নেই। পছন্দ হল তো পিঁড়িতে বসে গেলেই হয়। যত আগুপিছু করবে তত ফ্যাঁকড়া বেরোবে।

এই যে গোবিন্দ বিয়ে করল, একেবারে সোজা সরল ব্যাপার। দু'দিন কাজে কামাই দিয়ে হারান জ্যাঠাকে নিয়ে হাজির হয়ে সংক্ষেপে বিয়ে সেরে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এল, কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। বউ দিব্যি জুতে গেল সংসারে। প্যাঁচের কী আছে বাবা?

ভদ্রলোক শালাশালিরা যত লেখাপড়া শেখে ততই মাথায় ঘুঘু বাসা বাঁধে।

ক্যাবিনেটটায় পালিশ মেরে শেষ করল গোবিন্দ। কাজ করে সে বুঝতে পারে, কাজটা কেমন হল। জব্বর হয়েছে ব্যাপারটা, ফুটু বউদি শৌখিন মানুষ, পয়সার জন্য কোয়ালিটিতে আপস করে না। গোবিন্দর এরকম কাস্টমার খুব পছন্দ।

বউদি, হয়ে গেছে।

একটু ঘুমঘুম চোখে ফুটু বউদি উঠে এল পাশের ঘর থেকে। বিটুদিদির পুরোনো কালের বন্ধু। এলো চুল, ফোলা ফোলা পুরন্ত টুসটুসে মুখ, গায়ে একটা অলস নাইটি, এক চেনা বাড়ি থেকে আর এক চেনা বাড়ি, তা থেকে ফের আর এক চেনা বাড়ি, এরকম ভাবে চেন সিস্টেমে আজকাল গোবিন্দর কাস্টমার বাড়ছে। পুরোনো কাস্টমাররা ফের তাকে ডাকে। বার বার। এতেই গোবিন্দর অনেক হয় বটে, তবে এখন তো একটা বউও হল। এরপর ছেলেপুলে হবে। একটা দুটো বড় কন্ট্রাক্ট পেলে বড় মার্জিন হাতে নিয়ে শো-রুম খোলা যায়।

ভ্রু কুঁচকে ক্যাবিনেটটা দেখছে ফুটু। ক্রিটিক্যাল চোখ, চট করে প্রশংসা করবে না বটে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে গোবিন্দ বুঝে গেছে, এ জিনিস পছন্দ না হয়ে যায় না। গোবিন্দ পয়সা একটু বেশিই হাঁকে বটে, কিন্তু কাজে খুঁত রাখে না।

তোমাকে যেন কত অ্যাডভান্স দেওয়া আছে?

কুড়ি হাজার।

আর কত দিতে হবে?

পনেরো।

কাঠটা কী দিলে?

এক নম্বর সি পি। আগেই তো দেখিয়ে নিয়েছি।

আমার অত নামটাম মনে থাকে না। দামটা বড্ড বেশি নিলে।

কী যে বলেন বউদি।

এসব খদ্দের মাঝারি ভাল। দাম নিয়ে একটু আধটু খুঁত খুঁত করে, সে অভ্যাসে করে। দিয়েও দেয়। ভাল কাস্টমাররা দাম নিয়ে মাথাই ঘামায় না, তারা চায় সবাইকে টেক্কা দিতে। আর যারা ঘন ঘন বাড়ি বা অফিসের ডেকোরেশন আর ফার্নিচার পালটায়, তারা সবচেয়ে ভাল।

বিয়ে করলে, বউ কেমন হল?

ওই একরকম, আমাদের ঘরে মানিয়ে যায়।

কালো নাকি?

নোনা দেশের মেয়ে, কালোই তো হবে।

কেমন বিয়ে হল, জাঁকজমক করে?

না বউদি, শ্বশুরের ট্যাঁকের জোর নেই, সামান্যই আয়োজন। তার ওপর বর্ষাকাল, চারদিকে কাদা থকথক করছে। জোঁক, সাপ, মশা।

বাবা গো! লোকজন হয়েছিল?

ওই গাঁয়ের লোকজন, জনা পঞ্চাশেক হবে।

ঠিক মতো মন্ত্র পড়েছ তো!

ভারী লজ্জা পেয়ে হাসে গোবিন্দ, তা পড়েছি। তবে সোঁদরবনের পুরুত তো, শাস্তর-টাস্তর জানে বলে মনে হয় না। অং বং কী সব বলে গেল, সে কি বুঝেছি! উচ্চারণও ঠিকঠাক হয়নি। শ্রাদ্ধের মন্তর পড়িয়েই বিয়ে সারল কিনা কে জানে।

ও মাঃ! ও কী অলক্ষুনে কথা! শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়েছে নাকি?

পড়ালেই বা ধরছে কে? তবে ও দিয়ে কিছু হয় না। একটা নমো নমো ব্যাপার করতে হয় তাই করা।

আর বউভাত?

আজ্ঞে মাংস ভাত খাইয়েছি পেট পুরে, পাড়া ঝেঁটিয়ে এসেছিল সব। তা শ দেড়েক তো হবেই।

বউ পছন্দ হয়েছে তো!

ওই আছে একরকম। খারাপ নয়। সংসারী আছে।

বউকে খুব ভালবাসবে বুঝলে? মেয়েরা বরের আদর, ভালবাসা আর মনোযোগ চায়।

ওসব কি আর আমাদের হয় বউদি? সারাদিন পেটের ধান্দায় বাইরে পড়ে থাকি। বউকেও সংসার সামাল দিতে হয়।

বাসন মাজে নাকি?

তা আর মাজে না! খুব মাজে। বাসন মাজে, ঘর ঝাঁটায়, উঠোনে গোবরছড়া দেয়, কাজের অভাব কি?

তোমার তো টাকার অভাব নেই, কাজের লোক রাখ না কেন?

যাকে রাখব সেও তো কারও বউ বা ঝি। হরেদরে একই দাঁড়াচ্ছে।

কথাটা শুনে যেন ভারী অবাক হল ফুটু বউদি। কিছুক্ষণ খুব চিন্তিত মুখে চেয়ে থেকে বলল, বোসো, তোমার টাকাটা এনে দিচ্ছি।

এই মহিলা সংসারের কোনও কাজ করে না, গোবিন্দ জানে। বর বউ আর একটা মাস আষ্টেক বয়সের মেয়ে। এই আড়াই জনের জন্য ওদের চারটে কাজের লোক আছে। রান্নার লোক, বাচ্চার দিন রাতের আয়া, একটা চব্বিশ ঘণ্টার কাজের মেয়ে আর একজন ঠিকে ঝি। ড্রাইভারকে ধরলে পাঁচজন। ফুটু বউদি সারা দিন সাজেগোজে, খায়, ঘুমোয়, গাড়ি করে শপিং বা রেস্টুরেন্টবাজি করতে যায়। নিজের মেয়েটাকে অবধি বেশি নাড়াঘাঁটা করতে দেখেনি গোবিন্দ। কাজ না করে সারাদিন কী করে কাটায় কে জানে। অজয়বাবু বউকে খুব তোয়াজ করে, দেখেছে গোবিন্দ। দেখতে শুনতে ভাল ঠিকই কিন্তু এ মাল তাদের ঘরে অচল। যদি ফুটু বউদির মতো বউ তার কপালে জুটত তাহলে লোটাকম্বল নিয়ে নিরুদ্দেশ হতে হত তাকে। এর তুলনায় তার কালো আর খ্যাঁদাবোঁচা বউ অনেক ভাল। আর রংটাই যা চাপা নইলে গঙ্গার মুখখানা মোটেই কুচ্ছিত নয়, অনেকটা সন্ধ্যা রায়ের মতো আদল।

ফুটু বউদি পাঁচশ টাকার নোটের গোছাটা তার হাতে দিয়ে বলল, শোনো, যদিও তুমি তোমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করোনি, তবু তোমার বউয়ের জন্য পাঁচশো টাকা বেশি দিয়েছি। একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যেয়ো, ভুলো না কিন্তু।

গ্যালগ্যালে একটু হেসে টাকাটা গুনে পকেটে পুরে গোবিন্দ বলে,

ভুলব না বউদি। নেমন্তন্নের কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। তবে একদিন যদি সত্যিই আসেন তাহলে হুলুস্থুলু পড়ে যাবে।

গোবিন্দর কোনও নেশাটেশা নেই। একমাত্র কাজের নেশা আর টাকার নেশা। ইদানীং একটু বউয়ের নেশাও হয়েছে। সন্ধের পর বউয়ের জন্য প্রাণটা আঁকুপাঁকু করে, তবে উপায় নেই। এ সময়ে তার কিছু আদায় উশুল থাকে। বাড়ি ফিরতে সেই রাত আটটার গাড়ি। আগে বাড়ি ফেরার তাগিদ থাকত না। আজকাল ভারী টান। বউটা খুব ঘর-বার করে ওই সময়টায়।

পথে নামতেই পকেটে ঝিনচাক মিউজিক।

ফোনটা কানে তুলে বলল, হ্যালো।

হারান জ্যাঠার ঘরঘরে গলা বলল, গোবিন্দ নাকি রে?

হ্যাঁ জ্যাঠা।

তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আয়। তোর বউকে সাপে কেটেছে।

অ্যাঁ!

ঘাবড়াসনি। জলঢোঁড়া। সাপের কামড় আমি খুব চিনি। তবে তোর জন্য খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। একটু আদর সোহাগ করলে মেঘলা মুখে হাসি ফুটবে।

ডাক্তার দেখানো হয়েছে?

ওরে হ্যাঁরে হ্যাঁ। ডাক্তার একটু ওষুধ লাগিয়ে বাঁধন খুলে দিয়েছে। বলেছে, সেপটিক না হলে কোনও ভয় নেই। এখন সাপের কামড়ের চেয়ে বিরহের কামড়টাই বেশি, চলে আয়।

যাচ্ছি, দেখি যদি ছ'টার ট্রেনটা পাই।

বড্ড বুকটা উথাল পাথাল হচ্ছে এখন। এ জিনিস সাত দিন আগেও ছিল না। কোথায় কোন সোঁদরবনের গহিন রাজ্যে অচিন গাঁয়ে অধরা একটা মেয়ে পড়েছিল, তার খোঁজও রাখত না গোবিন্দ। পৃথিবী এক আশ্চর্য জায়গা বটে, সেই অজানা মেয়েটার জন্য এখন পারলে গোবিন্দ উড়ে যায়।

তা ওড়ার কমও হল না বড় একটা। ফার্ন রোডের আঁকাবাঁকা

পেরিয়ে ছ'টার ট্রেনটাই ধরে ফেলল যে। আহা, বউটা তার জন্য কাঁদছে।

BanglaBook.org

পাঁচ

মিনু! তোর কী ব্যাপার বল তো! কাল সারাদিন তোর মোবাইল বন্ধ ছিল, রাতে ফ্ল্যাটে ছিলি না, ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও নয়। কোথায় ছিলি?

তুই কী চাস?

এটা কি একটা প্রশ্ন হল? তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। জরুরি দরকার।

আমি চাই না।

চাস না! আশ্চর্যের ব্যাপার! কেন চাস না?

আমি ভয় পাচ্ছি।

ভয়! ভয় পাচ্ছিস কেন? কীসের ভয়?

তুই মারবি।

পাগল হলি নাকি? তোকে মারব কেন? কোনও দিন মেরেছি?

না। তুই কোনও দিন মারিসনি।

তাহলে? মারার প্রশ্ন উঠছে কেন?

তুই আমাকে কখনও মারিসনি কেন গোরা?

ইডিয়েটের মতো কথা বলিস না। তোকে মারব কেন?

তুই সবাইকে মারতিস। পাড়ায়, বেপাড়ায় সবাই তোকে ভয় পেত। সবাই জানত তুই রেকলেস অ্যাগ্রেসিভ, অল্পেই গরম হয়ে যাস। কিন্তু তুই কখনও আমার ওপর রাগ করিসনি।

রাগ করার মতো কিছু করিসনি, তাই করিনি। হঠাৎ এ সব কথা উঠছে কেন?

তোর কি মনে পড়ে, অনেক বছর আগে গোবিন্দপুরের সঙ্গে

পঞ্চাননতলার ছেলেদের মধ্যে বোমাবাজি হচ্ছিল? তুই আর আমি রবীন্দ্র সরোবরের মাঠে ফুটবল খেলে ফিরছিলাম! মনে পড়ে? বোমাবাজি দেখে তুই চট করে আমার ডানদিকটা আড়াল করে দাঁড়ালি! তারপর সারাক্ষণ আমাকে আগলে রেখে নিয়ে এসে পৌঁছে দিয়েছিলি বাড়িতে, আমাকে একবারের জন্যও জানতে দিসনি, একটা বোমার টুকরোয় তোর ডান হাতে অনেকগুলো ফুটো হয়ে অজস্র ধারে রক্ত পড়ছিল। মনে আছে?

বোকার মতো কথা বলিস না। কবে কী হয়েছিল সেসব ঘাঁটতে বসবার এখন কী প্রয়োজন পড়ল তোর? বুড়োরা বসে বসে পুরোনো দিনের কথা ভাবে। তুই কি বুড়ো?

অতীত যখন তাড়া করে তখন না ভেবে উপায় কী বল!

ফ্র্যাংকলি বল তো, তোর কী হয়েছে?

রিমোর্স।

তার মানে কী?

একেবারে শিশুকাল থেকে তুই আর আমি একসঙ্গে বড় হয়েছি, কিন্তু সমানে সমানে নয়। তুই ছিলি ছায়ার মতো, ছাতার মতো, ঢালের মতো, সব সময়ে, যখনই প্রয়োজন বা বিপদ দেখা দিয়েছে তখনই তুই নিঃশব্দে চলে এসেছিস আমাকে বাঁচাতে। একবার মার ওপর রাগ করে আমি আমার একটা নতুন জামা কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ফেলেছিলাম। বাবা অফিস থেকে ফিরে ঘটনা শুনে আমাকে একটা লাঠি দিয়ে মেরেছিল। মনে আছে তুই এসে এমন করে আমাকে চেপে ধরলি যে বাবার লাঠির একটা ঘা মাত্র আমার ডান কনুইতে লেগেছিল, বাদবাকি দশ-বারো ঘা খেয়েছিলি তুই।

হোপলেস! এ সব আগড়ম বাগড়ম শোনার জন্যই কি তোকে ফোন করছি নাকি? তুই কি কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এ সব পুরোনো কথা ফেঁদে বসলি?

প্রথম বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার কথা মনে পড়ে! তখন আমরা কতটুকুই বা। ইলেভেন বা টুয়েলভে পড়ি।

মিনু! স্টপ ইট!

শোন না পাগলা। চেঁচাচ্ছিস কেন? আমার খুব বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হত, কিন্তু সাহসে কুলোত না। তাই একদিন তোকে ইচ্ছেটার কথা বললাম। তুই একটু হেসেছিলি। তারপর একদিন তুই-ই চিৎপুরের ট্রামে করে নিয়ে গেলি আমাকে। কন্ডোম কেনার সাহস ছিল না, ভয়ে-লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছি তখন। তুই দৃকপাত না করে গিয়ে কিনে আনলি। রেড লাইট এলাকায় ঢুকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওই পরিবেশে। তুই অকুতোভয়। কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, দরদাম করতে হয় কিছুই আমরা জানতাম না। তুই বললি, আরে চল না, ভয় পাস না। আনাড়ি বলে যেন না ভাবে কেউ। লোকে আমাদের দেখছিল, অবাকও হচ্ছিল। আমি মুখ নিচু করে, অর্ধেক মুখ রুমালে ঢেকে তোর পাশে আড়াল হয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ তুই হাঁটছিলি মাথা সোজা করে। মাঝবয়সি এক মহিলাকে কী বলেছিলি মনে আছে? বলেছিলি, কুড়ির নীচের বয়সের কেউ আছে? মহিলার সে কী হাসি, ডেকে লোক জড়ো করে ফেলল, ওলো দেখে যা, ছোঁড়া দুটো ছুঁড়ি খুঁজতে এয়েছে। বলি পকেটে মালকড়ি আছে, না ফোতো বাবু?

মিনু, ইউ আর গোয়িং টু ফার। আমার কিছু সিরিয়াস কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটু শোন না। শেষ অবধি উই হ্যাড দি এক্সপেরিয়েন্স। আমি বাতাসীর সঙ্গে, তুই সুর্মার সঙ্গে। একশো টাকা করে নিয়েছিল।

অসহ্য, তুই থামবি?

আমার একটু বলতে ইচ্ছে করছে। প্রথম বার দুই তোর সঙ্গে যাই। তারপর সাহস করে একা একা গেছি বার তিনেক। কিন্তু কী আশ্চর্য জানিস, যখন একা গেছি তখনও মনে হয়েছে, তুই সঙ্গে আছিস। মনে হয়েছে, বিপদে পড়লেই তুই এসে হাজির হবি, কাছাকাছিই কোথাও ঘাপটি মেরে আছিস।

তুই কি আমার কথা শুনতে চাইছিস না?

না। আমি ভয় পাচ্ছি।

কেন ভয় পাচ্ছিস?

তুই আমাকে বকবি।

কচি খোকা হয়ে যাচ্ছিস নাকি? বিটুকে তুই কী বলেছিস? বিটু ইজ ভেরি অপসেট। আর আমার পক্ষেও অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার।

তোকে আমি সবই বলব। বলতে চাইছিও। কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি না হলে আমার কথা তুই বুঝবি কী করে?

তুই যা বলেছিস তা তো আর কোনও ফিলজফি নয়। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সন্দেহবাতিক, যার কোনও গ্রাউন্ড নেই।

কে বলল গ্রাউন্ড নেই?

আছে?

আছে, ভীষণভাবে আছে।

তুই কি জানিস যে, বিটুর সঙ্গে প্রথমবার ছাড়া আর কখনও আমি একা দেখা করিনি? আমাদের মধ্যে কখনও নির্জনে বা বিরলে কোনও কথা হয়নি! তার চেয়েও ইমপর্ট্যান্ট হল, বিটু কখনও কোনও দিনও আমাকে পছন্দ করত না! জানিস?

হ্যাঁ। অ্যান্ড ইটস পারশিয়ালি টু।

তাহলে কী করে তোর এরকম একটা অসম্ভব সন্দেহ হতে পারে? তুই ডাক্তার দেখা মিনু, গো টু এ সাইকিয়াট্রিস্ট।

যাইনি নাকি?

গেছিস?

অবশ্যই। সাইকিয়াট্রিস্টের কথা পরে। তার আগে আমার কিছু নিজস্ব কথা আছে।

তোকে কথায় পেয়েছে। এত ভ্যাজরং ভ্যাজরং করছিস কেন? এত টকেটিভ তো তুই ছিলি না!

প্লিজ, একটু ধৈর্য ধরে শোন।

কী শুনব বল তো! ছেলেবেলার কথা, রেড লাইট এরিয়ায় যাওয়ার কথা, এই তো! এ সব তো এখন ইররেলেভ্যান্ট।

সবটাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তোর সঙ্গে বেড়ে ওঠায় আমার অবস্থাটা কী হয়েছে জানিস? উঁচু চাপা ঘাসের মতো।

তার মানে?

কথাটা বুঝতে হলে তোকে কিছুক্ষণের জন্য মৃণাল হতে হবে। পারবি? মৃণাল না হলে তুই কিছুতেই বুঝতে পারবি না মৃণালের সমস্যাটা ঠিক কোথায়।

তোর কোনও সমস্যা নেই, আর সেইটেই তোর সমস্যা। জীবনটা সিমলেস হলে, ওয়েল কন্টেন্টেড হলে মানুষ কিছু সমস্যা তৈরি করে নেয়। নইলে চিবোবে কি?

তা নয় রে পাগলা। আচ্ছা আমি তো তোর চেয়ে তিন বছরের বড়। কিন্তু তুই কি তা কখনও মনে করেছিস? করিসনি। আমাকে ট্রিট করেছিস ছোট ভাইটির মতো। আমিও বরাবর তোকে আমার মেন্টর, আমার প্রোটেক্টর, আমার সেভিয়র বলে ধরে নিয়েছি। আর এভাবেই একদিন তুই আমার চেয়ে লেখাপড়ায় খাটো, সাকসেসে খাটো, ক্যারিয়ারে খাটো হয়েও আমার চোখে অপরিহার্য এক সুপারম্যান হয়ে গিয়েছিলি। এমনকী, যখন তুই সঙ্গে থাকতি না তখনও আমার মনে হত, তুই আমার পিছনেই আছিস। হয়তো রক্তে মাংসে নয়, কিন্তু তোর একটা প্রোজেকশন, একটা ছায়া শরীর কিংবা একটা এনটিটি সব সময়েই আমাকে পাহারা দেয়। এটা এক সময়ে আমাকে সাহস দিত। পরে সেটা জ্বালাতন হয়ে দাঁড়াল।

হ্যাঁ রে, বেঁচে থাকতেই কি কেউ ভূত হতে পারে?

আমি কি ভূতের কথা বললাম নাকি?

যা বলছিস তাতে তো ভূতপ্রেত বলেই মনে হচ্ছে আমাকে।

ভূত না হলেও আধিভৌতিক ব্যাপার। তারপর তুই রানিগঞ্জে গেলি। গত দু' বছরের বেশির ভাগ সময়েই তুই রানিগঞ্জে থেকেছিস। কলকাতায় এলেও আমার সঙ্গে তোর দেখা হয়নি। এই দু'বছরে আমি হয়তো এই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতাম। কিন্তু হল না। তুই বিটুর ভিতর দিয়ে ফিরে এলি।

বিটুর ভিতর দিয়ে? পাগল আর কাকে বলে! কী বলছিস যা তা!

তোর তো মনেই আছে প্রথম দিনটার কথা। তুই আমার হয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ঝিলের ধারে, এক দুপুরবেলায় বিটুকে অ্যাপ্রোচ করেছিলি। তোর সাহস দেখে আমার দূর থেকেই বুক দুরু দুরু করছিল। সে কী জলতেষ্টা! দেখলাম বিটু উঠে এল তোর কাছে। হেসে কথাও বলল। দূর থেকে দেখা, তবু কেমন যেন মনে হয়েছিল, বিটু তোর দিকে খুব বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। বিহ্বল শব্দটা লক্ষ করিস।

করেছি। বলে যা।

বিহ্বল শব্দটা অদ্ভুত, তাই না?

হ্যাঁ।

পরে তুই বিটুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলি। আর বিটুর আপত্তি হল না। আমার চেহারা ভাল, রেজাল্ট দারুণ ভাল, গানের গলা আছে, বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। অ্যাকসেপ্টেবল, তাই না?

নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, তুই কি ঠিক জানিস যে অ্যাকসেপ্টিবিলিটিই প্রেম কিনা? ভালবাসলে অ্যাকসেপ্ট করা যায় ঠিকই, কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করলেই ভালবাসা যায় কি?

ওসব তো আমার জানার কথা নয়। তোদের মধ্যে হয়েছেটা কী? পরিষ্কার করে বল তো বাপধন। ভ্যানতাঁরাটা কী নিয়ে?

তোকে নিয়ে।

তোদের মধ্যে আমি আসছি কোথা থেকে? আমি তো দু'বছর রানিগঞ্জে কয়লার গুঁড়ো মাখছি।

বলছি, বলছি। একটু শোন।

অনেকক্ষণ ধরে শুনছি, কিন্তু তোর কথা বোঝা যাচ্ছে না।

ওই তো বললাম, কিছুক্ষণের জন্য মৃণাল হয়ে যা, ঠিক বুঝবি।

মৃণাল হয়ে আমার কাজ নেই। ভাবের গাছ থেকে নেমে মাটিতে পা রেখে কথা বল, তাহলেই বুঝব।

তাই তো বলছি। কোন পর্যন্ত বলেছি বল তো!

বিটু তোকে অ্যাক্সেপ্ট করে নিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিটুর সঙ্গে কয়েক দিন মেলামেশার পরই আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল। একেবারে মসৃণভাবে। কোনও বাধা হল না। দু'জনের বাড়িতেও জানাজানি হল, মেনেও নেওয়া হল। শুধু একজন জ্ঞানী লোক একদিন একটা কথা বলেছিল। সে বলেছিল, হাসতে হাসতেই বলেছিল, মজা করেই বলেছিল, দুটো চুম্বকের নর্থ পোল যদি কাছাকাছি আনা যায় তাহলে তারা রিপালসড্ হয়ে যায়। আপনাদের বেলায় দেখছি, তা হয়নি। আমি বললাম, আমরা কি দু'জনেই নর্থ পোল। জ্ঞানী লোকটা বলল, আসলে আপনারা দু'জনেই খুব সুন্দর। আমি আজ অবধি এরকম কাপল দেখিনি, যারা দু'জনেই সমান সুন্দর। একজন সুন্দর হলে অন্যজন কুচ্ছিত হবেই। এটাই যেন ভবিতব্য। আর তাতে বোধহয় জোড়টাও মেলে ভাল।

জ্ঞানী লোকটা কে?

তুই চিনবি না। একজন জ্যোতিষী।

জ্যোতিষী! মাই গড! শেষ অবধি জ্যোতিষী পর্যন্ত গেছিস! তোকে নিয়ে তো পারা যায় না দেখি। জ্যোতিষীর কাছে কেন গিয়েছিলি, যোটক বিচার করতে নাকি?

না না, আমি নয়। বিটু, ওর জ্যোতিষশাস্ত্রে সাংঘাতিক বিশ্বাস। ও-ই আমাকে নিয়ে যায়।

জ্যোতিষী গুলি মার, আমি অনেক হ্যান্ডসাম পুরুষের সুন্দরী বউ দেখেছি। সুন্দরে-কুচ্ছিতে ভাল জোড় হয় এ কথা গাড়ল ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না। কর্মহীন কুষ্মাণ্ড ছাড়া জ্যোতিষীর কাছে যায় কেউ?

ভুল বুঝছিস, জ্যোতিষীর কাছে আমি যাইনি, বিটু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

আসল কথায় আসছিস না কেন? ফ্যাকড়া ছেড়ে তোদের প্রবলেমটা আমাকে বুঝিয়ে বল।

তোকে একটা মেঘলা দিনের কথা বলব? ছুটির দিন ছিল সেটা।

দুপুরে ফুটুর বাড়িতে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। তুই, আমি, বিটু, ফুটু আর ফুটুর বর অজয়। ওদের রাঁধুনি গরম গরম বেগুনি ভেজে দিচ্ছিল, আর কফি, মনে আছে?

না, অত মনে থাকে না আমার।

আড্ডার মাঝপথে তুই হঠাৎ কাজ আছে বলে চলে গেলি, কোনও উপরোধে কান দিলি না।

তো!

আমরা সবাই তোকে আর একটু থেকে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করছিলাম, শুধু বিটু চুপ করে ছিল, একটাও কথা বলেনি। কিন্তু তুই যখন জোর করেই চলে গেলি তখন বিটু তোর দিকে একবার বড় বড় চোখ করে চেয়েছিল। আমি কী দেখলাম জানিস? দেখলাম ওর চোখে লাস্ট অ্যান্ড ডিসপেয়ার।

বুঝিয়ে বল।

লাস্ট মানে একটা তীব্র অনুরাগ, ভয়ংকর প্যাশনেট একটা টান। সেই সঙ্গে একটা হতাশা, দুটোই একসঙ্গে।

দ্যাখ, তুই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলি বটে, কিন্তু মানুষ হিসেবে তুই বরাবর একটা আস্ত বুরবক। তুই বিটুর চোখে কী ছাইভস্ম দেখেছিস তা তুই-ই জানিস, কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতাম বিটু কোনও দিন আমাকে পছন্দ করত না। আর সেই জন্যই ফুটুর বাড়ির আড্ডা আমার ভাল লাগত না। তুই জোর করে নিয়ে যেতিস বলে যেতাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। বিটু যে তোকে পছন্দ করে না এটা বিটুও কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে। একবার বলেছিল, তুমি কি তোমার ওই গুণ্ডা ভাইয়ের ল্যাংবোট? কিন্তু এসব বাইরের প্যাটার্ন, ভিতরের বুনোট এরকম নয়। যা দেখা যাচ্ছে, প্রতীয়মান হচ্ছে তা সব সময়ে সত্য হয় না। আড়ালে, পিছনে উলটো কিছু থাকে।

যেমন?

যেমন তুই আর বিটু, অ্যাপ্যারেন্টলি পরস্পরের প্রতি উদাসীন, কেউ কাউকে পছন্দ করিস না, অথচ বিটুর চোখে মাঝে মাঝে একটা

অদ্ভুত ঝলক দেখা যায়। সেই ঝলক শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায়, যখন তুই কাছাকাছি থাকিস। ব্যাখ্যা করতে বলিস না, ব্যাপারটা আমার চোখ দিয়ে দেখা, আমার মস্তিষ্ক দিয়ে অনুবাদ করা, কাজেই তোর কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নাও হতে পারে।

নাই তো। আষাঢ়ে গল্প অ্যাকসেপ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।

প্লিজ, একটু শোন পাগলা। ব্যাপারটা কয়েকবার লক্ষ করার পর আমার একটা ধারণা জন্মাতে লাগল। মনে হল, শি ইজ আন্ডার ইওর হিপনোটিক স্পেল। বিটু নিজের বশে নেই, একটা গভীর সম্মোহনে আচ্ছন্ন। আর মনে হল, বিটুকে তুই রিমোট কন্ট্রোল করছিস।

এ কথা কেন মনে হল তোর?

বরাবর তুই আমাকে ঘিরে রেখেছিস, খেলার মাঠ থেকে শুরু করে সব রকম সিচুয়েশনে, আমাকে দিয়ে গোল করানোর জন্য নিজে শট না নিয়ে আমার পায়ে বল এগিয়ে দিয়েছিস। এখন এই ভালবাসাবাসির খেলাতেও বিটুকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার দিকে ঠেলে দিচ্ছিস তুই।

কী ভাবে মিনু? কী ভাবে? লজিক কোথায় গেল তোর?

বলছি। আমি জানি, আমার আড়ালে বিটুর সঙ্গে তোর কোনও যোগাযোগ ছিল না। তোরা কখনও কোনও কথা বলিসনি। তবু তোর অসম্ভব ক্ষমতায় বিটুকে কন্ট্রোল করছিস। হতে পারে তা টেলিপ্যাথি, হতে পারে তা ডিপ হিপনোটিজম।

আমি কি সুপারম্যান বলে তোর ধারণা?

একজ্যাক্টলি গোরা। তুই সুপারম্যান, তুই-ই সুপারম্যান।

তুই একদম পেগলে গেছিস।

তুই যে সুপারম্যান তা তুই হয়তো নিজেই জানিস না।

BanglaBook.org

ছয়

BanglaBook.org

আপনি কি মনে করেন না যে, প্রাণ এক অতি মহার্ঘ বস্তু?

হ্যাঁ, তাই তো শুনি।

এই যে বস্তুময় পৃথিবী, এই যে বাস্তবতা, ফলিত ব্যক্ত জগৎ, এই যে আকাশ, মাটি, আলো, অন্ধকার, এসব ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ আমার ইন্দ্রিয়াদি তাদের অনুভব করছে। আর এই ইন্দ্রিয়াদি ততক্ষণই কার্যক্ষম যতক্ষণ আমাদের অস্তিত্বে অবস্থান করছে ওই প্রাণ নামক রহস্যময় একটি জিনিস। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, তবু আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেরকমই শোনা যায় বটে।

প্রাণ গেলে এই বাস্তব জগৎটাও লুপ্ত হয়ে যায় আমাদের কাছে। আমরা হয়তো এক অনস্তিত্বে নিক্ষিপ্ত হই।

হতেই পারে।

তাই আপনাকে একটা কথা খুব সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি অনুমতি দেন।

দিলাম।

আপনি কি সম্প্রতি প্রাণের মূল্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করছেন?

কেন বলুন তো!

প্রাণ হাতে নিয়ে আপনি যে বিপজ্জনক কাজটি ইদানীং করছেন তা আমাদের খুবই উদ্বেগে রেখেছে। একটা অপঘাত ঘটলে প্রাণ সংশয় তো বটেই, তার সঙ্গে আরও নানা জটিলতা এসে উপস্থিত হয়।

যেমন?

যেমন ধরুন, এই বাড়িটাই অপঘাতের ফলে দূষণযুক্ত বলে আমাদের মনে হবে, অপঘাত ঘটলে বাচ্চারা ভূতপ্রেতের ভয় পাবে, আর সবচেয়ে বড় কথা পুলিশ এসে উৎপাত করবে।

হ্যাঁ, অপঘাত ঘটলে বা আমি সত্যিই মারা গেলে আরও অনেক রি-অ্যাকশন দেখা দিতেই পারে। কিন্তু আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন?

কেন? তা কি আপনি জানেন না? গত তিন চারদিন ধরে রোজ সকালে আপনি দশতলার ছাদে উঠে সরু রেলিং-এর ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছেন, এ ভাবলেই তো আমার হাত পা শিরশির করে। দারোয়ান দেখেছে, আমার ছোট মেয়ে দু'দিন দেখেছে, পাড়ার অভয়বাবুও দেখেছেন। জানতে পারি কি হঠাৎ আপনি এই দুঃসাহসিক কাজটি কেন করছেন?

রেলিং-এর ওপরটা কিন্তু খুব সরু নয়। আমার ধারণা আট-দশ ইঞ্চি চওড়া। ঠিক সরু বলা যায় না।

ধন্য আপনার বুকের পাটা। দশতলার রেলিং দু'ফুট চওড়া হলেও আমার কাছে তা সরুই মনে হবে।

লোকে এর চেয়েও সরু রাস্তা বেয়ে বিপজ্জনক পাহাড়ে ওঠে।

তাদের সঙ্গে দড়িদড়া, গাঁইতি, পিটন আরও অনেক কিছু থাকে। আপনি নিরালম্ব।

একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না। ছাদের কার্নিশে উঠলে একদিকে যেমন খাদ, অন্যদিকে আবার নিরাপদ ছাদ। কার্নিশের দুটো দিকই তো আর বিপজ্জনক নয়। জীবন তো ওরকমই, বিপদ-আপদ থাকে, আবার নিরাপত্তাও থাকে।

আপনি হয়তো একজন প্রচ্ছন্ন দার্শনিক। কিন্তু আপনার হঠাৎ এই উন্মার্গগামিতার কারণ কী?

ফ্রিডম, ফ্রিডম বোঝেন তো!

ফ্রিডম! মানে স্বাধীনতা?

না। এখানে ফ্রিডমের মানে মুক্তি।

বিপাকে ফেললেন। কীসের হাত থেকে মুক্তি খুঁজছেন আপনি?

ভয়ের হাত থেকে, জরাগ্রস্ততার হাত থেকে।

সেসব তো বড় ব্যাপার। আপনার কি ধারণা সেই মুক্তি ছাদের কার্নিশে আপনার জন্য বসে আছে?

আপনার যখন চাবি বা চশমা হারায় তখন সেগুলোর সঠিক অবস্থান কি আপনার জানা থাকে? আপনি তখন সম্ভব এবং অসম্ভব

সব জায়গাতেই সেগুলো খোঁজেন, তাই না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে।

আমিও মুক্তিকে সেভাবেই খুঁজছি। কারণ সে কোথায় আছে তা আমার জানা নেই। আমাকে নানাভাবে সারা জীবন তাকে খুঁজে যেতে হবে।

এমনিতেই আমার নানারকম ভয়-ভীতি, উদ্বেগ আর অশান্তি আছে। তার সঙ্গে আপনি আর একটা উদ্বেগ আর ভয় জুড়ে দিলেন। আপনার কাছাকাছি থাকা যে এত বিপজ্জনক তা আগে জানলে কোন শালা এ বাড়িতে ফ্ল্যাট কিনত?

আপনার কথায় আমি মাঝে মাঝে আমার মনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। নিজেকে আমারও বিশেষ পছন্দ হয় না।

আহা, সে তো আমারও হয় না।

আচ্ছা, আপনি কখনও পুনর্ণবা শাক খেয়েছেন?

হঠাৎ শাকের কথা কেন এনে ফেললেন বুঝতে পারছি না। আপনাকে বুঝে ওঠার চেয়ে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বোঝা সহজ। তবে কথাটা যখন তুললেন তখন বলি, গিন্নি পছন্দ করেন না বলে আজকাল আর আনা হয় না। কিন্তু অতি সুস্বাদু শাক।

আমারও সম্প্রতি মনে হয়েছে পুনর্ণবা অতি সুস্বাদু শাক। গঙ্গা একটু হলুদ আর আদাকুচি দিয়ে এমন রেঁধেছিল যে, এখনও স্বাদটা মুখে লেগে আছে।

গঙ্গা কে?

আমাদের গোবিন্দ মিস্ত্রির নতুন বউ। সুন্দরবনের মেয়ে।

একটা সিরিয়াস কথার মাঝখানে হঠাৎ আপনার এই গঙ্গা আনয়নের উদ্দেশ্য কী? কথা হচ্ছে রোজ সকালে দশতলার ছাদে সরু কার্নিশের ওপর উঠে আপনার দুঃসাহসিক হাঁটাচলা নিয়ে। কথাটা আগে শেষ করুন।

এটা সেই কথারই অ্যাপেনডিক্স। গোবিন্দ মিস্ত্রি তার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। যাওয়া হয়নি। তাই পরে সে একদিন

এসে খুব কাকুতি মিনতি করছিল তার বাড়িতে একবার যাওয়ার জন্য। রোববারে গিয়েছিলাম, সোনারপুরের একটু বাইরে গাঁয়ের মতো একটা জায়গা। গিয়ে ভারী ভাল লেগেছিল। চারদিকে গাছপালা, বাগানে ফলন্ত শাকসবজি, ছিমছাম ছোট একটু বাড়ি। পুকুরে স্নান করে দাওয়ায় ভাত খেতে বসলাম। শাক, ডাল, পোস্তর বড়া, মাছের ঝোল।

আর বলবেন না। জিভে জল আসছে।

মেনুর কথা বলছি না। বউটার কথা বলতে চাইছি। বাদা অঞ্চলের নোনা গাঙের ধারে তার বাড়ি। ভারী লাবণ্যময়ী। বর বউ কেউ বিয়ের আগে কাউকে চিনত না। কিন্তু এখন তাদের কী ভালবাসা। মাত্র দশ-পনেরো দিনে।

মাছের ঝোলটা কী দিয়ে রেঁধেছিল? সর্ষেবাটা নাকি?

আপনি বোধহয় একটু পেটুক আছেন। এটা মাছের ঝোলের গল্প নয়। ভালবাসার গল্প, মুক্তির গল্প।

তাই বলুন। তবে পুনর্ণবা শাকের কথা তোলার দরকারটা কী ছিল? দিলেন তো মুডটা খারাপ করে!

আপনি পুনর্ণবা নামটা কি লক্ষ করেছেন? পুনরায় নতুন হয়ে ওঠা।

ওঃ, তাই বলুন! এবার বুঝেছি। আপনার নবজন্ম হল বোধহয়।

না, অতটা নয়। আসলে গোবিন্দ মিস্ত্রি কারিগর ভাল হলেও অতি ঘড়েল লোক। পয়সাটা খুব চেনে। ওর জগৎ হল কাঠ, ডিজাইন, ছেনি, হাতুড়ি, বাটালি, করাত নিয়ে, আর টাকা। এর বাইরে আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম কেঠো মিস্ত্রিটার চোখেমুখে একটা আলো ঝলমল করছে। বার বার আমাকে বলছিল, বউ আসার পর নাকি ওর বরাত ফিরেছে, ঘরে বড্ড শান্তি পাচ্ছে এখন। আর বউটাকেও দেখলাম, ওরকম একটা কেঠো মিস্ত্রি স্বামীকে পেয়ে অহঙ্কারে যেন ফুলে ফুলে উঠছে। এসব কী করে হয় মশাই?

বিয়ের পর নতুন নতুন ওরকম তো হয়ই। অবাক হওয়ার কী আছে? ক'টা দিন যেতে দিন, দেখবেন ঘরে ধুন্ধুমার লেগে গেছে।

তা বটে। তবু বেশ লাগল কিন্তু। মনে হল এই ভালবাসা জিনিসটার যদি রোজ নবীকরণ হয় তাহলে পৃথিবী পালটে যাবে।

ওসব কথা ছেড়ে দিন মশাই। কাচেরও কোরণ্ড হবে, ধুলায় লুটায়ে যাবে। তাই কি হয় নাকি। ভাত যখন ফোটে তখন হাঁড়ি জুড়ে উথাল পাথাল। তা বলে ভাতকে তো আর চিরকাল ফুটে যেতে দেওয়া যায় না। তাকে নামাতে হয়, জুড়োতে হয়, ফ্যান ফেলে দিতে হয়। বুঝলেন?

হ্যাঁ। বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না।

ভালবাসা নিয়ে কি রিসেন্টলি আপনার কোনও প্রবলেম হচ্ছে? আমার গিন্নি বলছিলেন, সেই সুন্দর মেয়েটা প্রতি ছুটির দিনে আসত। অনেকক্ষণ থাকত। মাঝে মাঝে জোড়ে বেরিয়েও যেতেন গাড়ি নিয়ে। কিন্তু আজকাল মেয়েটা আসছে না। প্রবলেমটা কী?

নতুন কোনও প্রবলেম নয়।

দশতলার কার্নিশে উঠে আপনার বিপজ্জনক হাঁটাচলার সঙ্গে কি এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে?

আপনি আমার ভাই গৌরাঙ্গকে তো দেখেছেন!

হ্যাঁ। অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ লোক।

গোরার কোনও ভারটিগো নেই। ইচ্ছে করলে সার্কাসে নাম লেখাতে পারত। ছেলেবেলা থেকে ও কার্নিশে হাঁটে। একবার চোখ বেঁধে হেঁটেছিল। ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল পাঁচতলার ছাদ।

আপনারা কী ধাতুতে গড়া কে জানে মশাই। ফুটবল-টুটবল খেলুন। ক্রিকেট খেলুন, বক্সিং-টক্সিং করুন, ঠিক আছে। কিন্তু এই প্রাণঘাতী খেলা কেন?

আমি চাইলেও গোরা কিন্তু কখনও আমাকে কার্নিশে উঠতে দিত না। বলত, তুই ভিতু ছেলে, নার্ভ ঠিক রাখতে পারবি না। পড়ে যাবি। আর এইভাবে ও আমাকে কখনও আমার মতো হতে দেয়নি।

আপনি যখনই আপনার ওই ভাইয়ের কথা বলেন তখন কেমন যেন

একটু ভাবালু হয়ে পড়েন। খুব ভালবাসেন বুঝি গোরাবাবুকে?

খুব। ও তো আমার হিরো ছিল।

এখন নেই?

এখনও ও আমার হিরো। জীবনে কোনও কোনও জিনিস আছে যা বদলানো যায় না। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, যেদিন আমি সকালে প্রথম দশতলার কার্নিশে উঠলাম সেদিন প্ল্যান করে উঠিনি। কোনও প্রস্তুতি ছিল না। ছাদে গিয়ে মনে হল, একটু কার্নিশে উঠি তো! গোরা কতবার উঠেছে। যেই উঠতে যাচ্ছি, স্পষ্ট গোরার গলা পেলাম, উঠিস না মিনু, তোর নার্ভ নেই। পড়ে যাবি। আমি বললাম, না, আমি ঠিক পারব। গোরা বলল, এ শুধু ব্যালান্সের খেলা নয় রে, শুধু নার্ভের খেলাও নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কী? ও বলল, যদি বাহাদুরি দেখাতে চাস তাহলে পারবি না। কিন্তু যদি মনে করে নিস যে, কার্নিশে যখন পা রাখার জায়গা আছে, তখন পড়ব কেন? পড়াটা তো স্বাভাবিকতা নয়। যেমন রাস্তায় হাঁটিস তেমনি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যা, ডাইনে বাঁয়ে তাকা, উপভোগ কর, দেখবি পেরে যাবি।

সব্বোনেশে ব্যাপার মশাই!

আর আমিও তাই করলাম। দিব্যি গট গট করে হেঁটে লম্বা কার্নিশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে ফেললাম। একটুও ভয় হল না।

এসব কাজের কথা নয়। হয়নি বলে যে হবে না, তা তো নয়। গোরা আপনাকে প্রম্পট করল আর আপনি অতিশয় বিপদের মধ্যে নিজেকে নিয়ে ফেললেন, এ আপনার কেমন ধারা হিরোওয়ারশিপ?

আমার বিশ্বাস, গোরা আমার সঙ্গে ছিল।

ছিল?

অ্যাপারেন্টলি নয়। কিন্তু গোরার ছায়া থাকে। ওর একটা প্রোজেকশন থাকে। আমি আপনাকে একটা মুক্তির কথা বলছিলাম না?

হ্যাঁ। সেটা চিনে ভাষা বলে আমি বুঝতে পারিনি।

চিনে ভাষা নয়। আপনি যে বুঝতে পারেননি তাতেও আপনার দোষ নেই। আমাকে ঠিক মতো বুঝতে গেলে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য মৃণাল মিশ্র হয়ে যেতে হবে। কিন্তু মুক্তিটা আমার বড় দরকার।

সে তো বলছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কীসের মুক্তি, কেন মুক্তি।

আজ বুঝতে পারছি, আমার মুক্তি নেই। যত চেষ্টাই করি না কেন, ওই বন্ধন, ওই ছায়া, ওই প্রক্ষেপের হাত থেকে কিছুতেই আমার মুক্তি নেই।

BanglaBook.org

সাত

ফুটব্রিজের র‍্যাম্প থেকে একটা মেয়ে উঠে আসছে। পরনে নীলরঙা জিনস আর সাদা কুর্তা, চোখে রোদচশমা, দামাল হাওয়ায় খাটো চুল ঝাড়নের মতো ঝাপটা খাচ্ছে চোখে মুখে।

ফুটব্রিজের মাথায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে গৌরাঙ্গ। কেন এখানে তাকে আসতে বলেছে বিটু তা সে জানে না। ফুটব্রিজ দিয়ে কেউ রাস্তা পেরোবার চেষ্টা করে না বলেই বেশির ভাগ ফুটব্রিজ পরিত্যক্ত জিনিসের মতো পড়ে থাকে।

ধীরে ধীরে উঠে আসে মেয়েটি। একটু হাঁফ ধরেছে বোধহয়। উঠে একটু দাঁড়াল। চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। ফুটব্রিজের ওপরে খুব ব্যাকুল হাওয়ার লুটোপুটি। চুল ধরে টানে, জামা ধরে টানে।

আমি একটু দেরি করে ফেলেছি। কতক্ষণ এসেছেন?

তিনটেয় আসতে বলেছিলেন, পৌনে তিনটেয় এসে গেছি।

রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল বিটু। দূরের দিকে চোখ রেখে বলল, কিছু বুঝতে পারলেন?

না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, ও একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

জানি। বুঝতে পারছি না আমাদের রিলেশনটা শেষ হয়ে যাবে কি না।

না না, রিলেশন শেষ হবে কেন? একটু সময় দিন, ও কাটিয়ে উঠবে।

বিটু মাথা নেড়ে বলল, না, ও পারছে না। আপনি কি জানেন যে, ও আজকাল দশ তলার ছাদে উঠে কার্নিশের ওপর দিয়ে হাঁটে?

মাই গড!

একদিন মরবে। আমার এত ভয় করছে!

রেলিঙের ওপর গৌরাঙ্গর হাতের মুঠো আপনা থেকেই শক্ত হয়ে গেল। আপন মনে স্বগতোক্তির মতো সে বারবার বলতে লাগল, না না, মরবে না... মরবে না... মরতে দেব কেন ওকে!

বিটু এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে চাইল গৌরাঙ্গর দিকে, একটা সত্যি কথা বলবেন?

বলব, বলুন।

ওয়্যার ইউ হোমোসেকসুয়াল পার্টনারস?

মাথা নাড়া দিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, না। উই আর নট গে।

রোদচশমার ভিতর দিয়ে এক রহস্যময় চোখে বিটু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গৌরাঙ্গর দিকে।

দেন হোয়াট?

আমি জানি না। আমি ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মৃণাল চাইছে না। ভয় পাচ্ছে। বাচ্চাছেলের মতো বলছে, তুই আমাকে মারবি।

আপনি কখনও ওকে মেরেছেন?

না। বরং ওকে মার থেকে বরাবর বাঁচাতে চেয়েছি।

জাস্ট লাইক এ হিরো?

কেউ আমাকে হিরো বানিয়ে তুললে আমি কী করতে পারি?

ইমেজটা ভেঙে দিতে পারেন।

কীভাবে?

ওই যে লাল মারুতিটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে আমাদের ডানদিকে ওই গাছটার তলায়!

দেখতে পাচ্ছি।

উই আর ইন ফুল ভিউ।

তার মানে?

গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটে মৃণাল বসে আছে। আমাদের দেখছে।

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, মৃণাল বসে আছে? এতক্ষণ বলেননি কেন? চলুন, ওর কাছে যাই।

বিটু দৃঢ় গলায় বলল, না। আপনি যাবেন না।

তা হলে?

আমি চাই, ও আসুক।

ও যে ভয় পাচ্ছে আমাকে।

আপনি যাবেন না। আই ওয়ান্ট টু গিভ হিম এ শক।

ঠিক আছে।

হোল্ড মাই হ্যান্ড।

বিটু, এসব কী হচ্ছে?

জাস্ট হোল্ড মাই হ্যান্ড।...না না, ওভাবে নয়, পুরুষমানুষের মতো ধরুন। জোর দিয়ে।...হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার এক ঝটকায় আমাকে টেনে নিন বুকের মধ্যে। নিন...

প্লিজ! এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

শুনুন, এটা আমার জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। জাস্ট ডু ইট।

ফুটব্রিজের ওপর, প্রায় প্রকাশ্য দিবালোকে কাজটা করতে হল গৌরাঙ্গকে। সে তার দুই শক্ত হাতে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিল বিটুকে। কী নরম, নমনীয় শরীর বিটুর।

তার বুক থেকে মুখ তুলে হাঁফ ধরা গলায় বিটু ফিসফিস করে জরুরি গলায় বলল, নাউ কিস মি।

আমি পারব না বিটু।

ডু ইট কাওয়ার্ড! কিস মি!

গৌরাঙ্গর শরীর জুড়ে দামামার শব্দ। এই নকল যুদ্ধেও যেন আসল লড়াইয়ের উত্তেজনা। সে ধীরে ধীর নত হল। তারপর এক অসম্ভব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গভীর চুম্বনে তার ঠোঁট লগ্ন হয়ে গেল বিটুর ঠোঁটে।

কিন্তু গাড়ির দরজা খোলার কোনও শব্দ হল না তো! শোনা যাচ্ছিল না কোনও দ্রুত পদশব্দ। র‍্যাম্প বেয়ে কেউ উঠে আসছে না তো!

বিটুকে ছেড়ে দিয়ে গাড়িটার দিকে তাকাল গৌরাঙ্গ।

কী দেখছেন?

মৃণাল এল না তো!

বিটু শ্লথ হাতে কপাল থেকে চুল সরানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে উদাস গলায় বলল, মৃণাল নেই।

তার মানে?

প্যাসেঞ্জার সিটে কেউ নেই গৌরাঙ্গ।

তা হলে?

উদাস, ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে র‍্যাম্পের দিকে হাঁটতে থাকে বিটু। একবার মুখ ফিরিয়ে কী যেন বলল আস্তে করে। লুটেরা বাতাস কথাটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। গৌরাঙ্গ শুনতে পেল না।

বিটু ধীর পায়ে নেমে যাচ্ছে র‍্যাম্প বেয়ে। বজ্রাহতের মতো ফুটব্রিজের ওপরে দামাল হাওয়ায় দাঁড়িয়ে রইল গৌরাঙ্গ।